নারী যখন মা

নারী সবার আগে একজন মানুষ

নারীর রাজনীতি

নারীত্ব, নারী-পুরুষের পার্থক্য

অভিভাবকত্ব

নারী যখন স্ত্রী

নারীর কাজ

বহুবিবাহ

নারী যখন কন্যা

তালাক

স্ট্যাটাস অব উইমেন ইন ইসলাম

ড. ইউসুফ আল কারযাভী

উত্তরাধিকার

নারী-পুরুষের মেলামেশার সীমা

অনুবাদ

আলী আহমাদ মাবরুর

স্ট্যাটাস অব উইমেন ইন ইসলাম

ড. ইউসুফ আল কারযাভী

অনুবাদ
আলী আহমাদ মাবরুর

স্ট্যাটাস অব উইমেন ইন ইসলাম
ড. ইউসুফ আল কারযাভী
অনুবাদ : আলী আহমাদ মাবরুর

প্রকাশনা
ঋদ্ধ প্রকাশন
বাড়ী ৫, রোড ১, ব্লক ডি, পল্লবী, মিরপুর, ঢাকা ১০০০
ridhdhoprokashon@gmail.com
মোবাইল: ০১৩০৪৩২৭৮৭৯

প্রকাশ
মে ২০২১

প্রচ্ছদ
শাহিদী রিদওয়ান

পৃষ্ঠা বিন্যাস
ত্রৈ প্রি প্রেস

মুদ্রণ
অনওয়ার্ড প্রিন্টার্স
২৬৭/ই, কমিশনারের গলি, ফকিরেরপুল, মতিঝিল, ঢাকা ১০০০

মূল্য
টাকা ১৮০ মাত্র

ISBN : 978 984 95164 -1-5

Status of Women in Islam
Dr. Yusuf Al- Qaradawi
Translation : Ali Ahmad Mabrur

অনুবাদকের কথা

আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহর অশেষ মেহেরবানীতে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বইয়ের কাজ শেষ করতে পারলাম। এই বইটি সম্বন্ধে কথা বলতে গেলে প্রথমেই কৃতজ্ঞচিত্তে যার কথা উল্লেখ করতে হয় তিনি হলেন, নন্দিত লেখক ও সাহিত্যিক জনাব জিয়াউল হক। একদিন একটি আলোচনা বৈঠকে কথা প্রসঙ্গে তিনি আমাকে বললেন, অনেক বছর আগে ওস্তাদ ইউসুফ আল কারযাভীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার সময় এই বইটি আমার চোখে পড়েছিল এবং আমি তাকে বইটি বাংলায় অনুবাদ করার জন্য অনুমতি চেয়েছিলাম। তিনি সানন্দে অনুমতি দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন, তুমি যেহেতু ইদানিং অনুবাদ করছ তাই তুমি চাইলে বইটি অনুবাদ করতে পারো। কিন্তু কেন যেন কাজটি করা হয়নি।

আমার মনে আছে, এ বিষয়ে আমি আমার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে ১০ সেকেণ্ডও সময় নিইনি। সঙ্গে সঙ্গেই বলেছিলাম, অবশ্যই আমি কাজটি করতে চাই। কারণ, অনুবাদক হিসেবে ইউসুফ আল কারযাভীর কোনো কাজের সাথে সম্পৃক্ত হওয়াটা আমার জন্য পরম সৌভাগ্যের। তাই এ মহান জ্ঞানসাধকের একটা বই অনুবাদ করার তৌফিক দান করায় আমি মহান আল্লাহর দরবারে লাখ শুকরিয়া আদায় করছি।

ইসলামে নারীর অধিকার এবং মর্যাদাই মূলত বইটির মূল আলোচ্য বিষয়। তাই স্বাভাবিকভাবেই বিষয়টি কিছুটা নারী বিষয়ক মনে হতে পারে। তবে বইটি অনুবাদ করতে গিয়ে আমার মনে হয়েছে, বইটি নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য সমান প্রযোজ্য। বিবাহিত, অবিবাহিত সকলের জন্যই বইটি পড়া জরুরি। কারণ, বইটিতে লেখক কোরআন ও হাদিসের আলোকে পারিবারিক ও দাম্পত্য জীবনের সুখ-শান্তির পথটি নিখুঁতভাবে তুলে ধরেছেন, যার সন্ধানে দুনিয়ার মানুষ ছুটছে ম্যারাথন গতিতে।

প্রসঙ্গত এখানে আরও একটি কথা বলা দরকার যে, এ বিষয়ে ইউসুফ আল কারযাভীর ফতওয়া-ই-মুআসেরাহ নামের আরও একটা বড় আকারের বই আছে। তাই প্রশ্ন জাগতে পারে, তারপরও তিনি কেন এ বইটি লিখেছেন? আমার বিবেচনায় ওই বইটি একটু অগ্রসর পাঠকের জন্য, যারা এ বিষয়ে চিন্তা করতে চান।

সাধারণ পাঠক, যারা ইসলামে নারীর অবস্থানের বিষয়টিকে খুব সহজে বুঝতে চান, নারীদের বিষয়ে ইসলামের অবস্থানকে ধারণ করতে চান, তাদের উপযোগী করেই বর্তমান বইটি লেখা। নারী-পুরুষ উভয়ই উভয়ের স্বার্থেই পরস্পরকে

সম্মান ও শ্রদ্ধা করবে। কিন্তু সে সম্মান ও শ্রদ্ধা কিভাবে করবে বা পারিবারিক ও দাম্পত্য জীবনের কোন্ ধরনের পরিস্থিতি আমরা কিভাবে মোকাবেলা করব, তা বইটিতে অত্যন্ত সুন্দরভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, মূল বইটি আরবি ভাষায় লেখা। এ অনুবাদটি মূল বইয়ের ইংরেজী অনুবাদ অনুসরণে অনূদিত। মূল বইটি ইংরেজি ভাষায় অনুবাদ করেছেন আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শায়খ মোহাম্মদ গেমিয়াহ।

হাদিসের রেফারেন্স যাচাই করতে গিয়ে বাংলাভাষী পাঠকের সুবিধার্থে দু-এক জায়গায় ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত হাদিসের অনুবাদ গ্রন্থের সূত্র ব্যবহার করা হয়েছে। মূল লেখার রেফারেন্সে এমন অনেক হাদিস গ্রন্থের নাম উল্লেখ করা হয়েছে যেসব গ্রন্থের সাথে বাংলাভাষী পাঠক আদৌ পরিচিত নন।

কোনো কোনো ক্ষেত্রে লেখক কুরআনের একই আয়াত বেশ কয়েকবার উদ্ধৃত করেছেন। লেখার এরকম রীতির সাথে এদেশের পাঠক খুব একটা পরিচিত নন। মূল বিষয় হলো, একই আয়াতের বহুমাত্রিক বিশ্লেষণ হতে পারে। আবার বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবের জন্য একই আয়াত পর্যাপ্ত দিকনির্দেশনা প্রদান করতে পারে। এটাই কুরআনের অন্তর্নিহিত মাহাত্ম্য। প্রত্যেক প্রসঙ্গের ক্ষেত্রেই সংশ্লিষ্ট আয়াতটি উদ্ধৃত করে লেখক কুরআনের বার্তার সাথে পাঠককে নিবিড়ভাবে সংযুক্ত করতে চেয়েছেন। বারবার উল্লেখের কারণে বিরক্তির পরিবর্তে এটিকে অনুধাবন-বান্ধব বিবেচনা করা অধিকতর কল্যাণকর।

ঋদ্ধ প্রকাশন বইটি প্রকাশ করার উদ্যোগ নিয়েছে। আমি তাদের এ উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাই এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আমার মতো একজন অনুবাদকের বই প্রকাশের আর্থিক ঝুঁকি নেয়ার জন্য।

আমি আশাকরি, বইটি ঋদ্ধ প্রকাশনের একটি মানসম্মত কাজ হিসেবে সর্বমহলে স্বীকৃত হবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদের ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাটুকু কবুল করুন। আমিন!

আলী আহমাদ মাবরুর
উত্তরা, ঢাকা

ভূমিকা

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীনের, যিনি সমগ্র বিশ্বজগতের মালিক, যিনি পরম করুনাময় ও দয়ালু। দরুদ ও সালাম পেশ করছি শেষ নবী মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি। আর তার গোটা আহলের ওপর, তার সাহাবীগণের ওপর এবং তাঁর নির্দেশনা মোতাবেক যারা নিজেদের জীবনকে গড়ে তোলার চেষ্টা করছেন, সেসব সৎকর্মপরায়ণ বান্দাদের ওপর আল্লাহ রহমত ও নেয়ামত বর্ষণ করুন।

আমরা সবাই স্বীকার করি যে, সমাজের অর্ধেক নারী এবং কোনো অবস্থাতেই নারীদেরকে অবহেলা বা হেয় করা উচিত নয়। তাদেরকে অলসভাবে ফেলে রাখাও কাম্য নয়। তাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করা যাবে না। তাদের অধিকারগুলোকে অক্ষুণ্ন রাখতে হবে।

এসব নিয়ে আমরা সবসময়ই আলোচনাও করি বা শুনিও। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যে প্রশ্নটা এসে সামনে দাঁড়ায় তা হলো, নারীরা সমাজের অর্ধেক হলেও সমাজে তাদের প্রভাব কতটা? নারীরা বিভিন্ন হিত বা অহিতকর কাজে তাদের স্বামী-সন্তানকে কতটা প্রভাবিত করতে পারে? নাকি আদৌ তাদের কোনো প্রভাব নেই।

প্রখ্যাত কবি হাফিজ ইব্রাহিম নারীকে একটি পূর্ণাঙ্গ শিক্ষাপিঠের সঙ্গে তুলনা করে এই প্রশ্নগুলো উত্থাপন করেন। তার মতে, এই শিক্ষাপিঠকে সঠিকভাবে গড়ে তোলা গেলে একটি আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠা করা যাবে।

বিজ্ঞানী, চিন্তাবিদ, নেতা, সংস্কারক, দা'য়ী এবং শিক্ষাবিদসহ সকল পেশার শীর্ষ ব্যক্তিবর্গ নারীর ইতিবাচক বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। তারা নারীর প্রতি ইনসাফ করার তাগিদ দিয়েছেন, নারীর সাথে সম্মানজনক ব্যবহার করতে বলেছেন। নারী বিষয়ক যেকোনো অস্বচ্ছতা, অসঙ্গতি এবং জুলুমকে পরিহার করে তাদের জ্ঞানার্জনের ওপর এবং বিভিন্ন পেশা ও কাজে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণের ওপর চিন্তাশীলগণ জোর দিয়েছেন। বিশেষ করে বিয়ের ব্যাপারে নারীরা যাতে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দিতে পারে তাও তারা নিশ্চিত করতে বলেছেন।

অবশ্য কেউ কেউ এটুকুতে সন্তুষ্ট নয়। তারা নারীদের বিবাহপূর্ব যৌনাচার, সমকামিতা, অনিয়ন্ত্রিত গর্ভপাত, পরিবারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এবং সমাজ ও ধর্মীয় মূল্যবোধগুলোকে অগ্রাহ্য করারও এখতিয়ার প্রত্যাশা করেন।

১৯৯৫ সালে বেইজিং-এ নারীদের বিষয়ে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে উল্লেখিত অনাচারগুলোকে বৈধতা দেয়ার দাবি তোলা হয়েছিল। তাই এই সম্মেলনকে নিয়ে মুসলিম ও খৃস্টান জগতে ব্যাপক বিতর্ক ও শোরগোল শুরু

হয়ে যায়। কারণ, মুসলিমদের কাছে এমন এক ঐশী গ্রন্থ রয়েছে যা নারীকে প্রকৃত অর্থেই সম্মান এবং নারীর প্রতি ইনসাফ করার নির্দেশ দেয়। আল কুরআনের বরকতেই আইয়ামে জাহেলিয়াতের যুগে নারীরা অন্ধকার থেকে মুক্তি পায়।

মহাগ্রন্থ আল কুরআন নারীদেরকে মানুষ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। পাশাপাশি একজন নারী, একজন কন্যা, একজন স্ত্রী এবং একজন মা হিসেবেও তার প্রাপ্য মর্যাদা নিশ্চিত করে। সর্বোপরি ইসলাম নারীকে সমাজের একজন দায়িত্বশীল সদস্যা হিসেবে সম্মান প্রদান করে।

এটা অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নেই যে, এরপরও বিভিন্ন সময়ে নারীরা প্রতারণার শিকার হয়েছে। ধর্মশিক্ষা ও বাইরে গিয়ে কাজ করার অধিকার থেকেও বঞ্চিত থেকেছে। এমনকি তারা মসজিদে যেতে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। অনেক দীনদার মুসলিম পরিবারের মেয়েদেরকে তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিয়ে দেয়া হয় এবং তা মেনে না নেয়ার কারণে, সেসব মেয়েদেরকে জোরপূর্বক ঘরে বন্দী করে রাখা হয়।

এসবই ঘটেছে সঠিক ও যথাযথ ধর্মীয় জ্ঞানের অভাবে। তবে, যত জায়গায় এবং যতভাবে নারীদেরকে বঞ্চিত করা হোক না কেন, কিছু মুসলিম সবযুগেই সবখানে ছিল, যারা এই বঞ্চনাকে কখনোই মেনে নিতে পারেননি। তারা সাধ্যমত প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ করার চেষ্টা করেছেন।

ইসলামে নারীদের যে সম্মানের আসন দেয়া হয়েছে, এ বইতে সংক্ষেপে তা তুলে ধরা হয়েছে। এ বইয়ের অনেকগুলো আলোচনাই ইতোপূর্বে আরো বিস্তারিত আকারে 'আল হালাল ওয়াল হারাম ফিল ইসলাম' এবং 'ফতওয়া-ই-মুআসেরাহ' গ্রন্থে আলোচনা করা হয়েছে। তারপরও আমরা মনে করি, পাঠক বইটি পড়ে অনেকগুলো বিষয়ে ইসলামের অবস্থান সম্পর্কে জানতে পারবেন এবং সে আলোকে নিজেদের চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গি সংশোধন করতে সক্ষম হবেন। যুবকরা সংকীর্ণতা ও উদারতার মাঝামাঝি অবস্থান নিতে পারবে। আল্লাহ বলেন :

وَمَآ اُرِيْدُ اَنْ اُخَالِفَكُمْ اِلٰى مَآ اَنْهٰكُمْ عَنْهُ ؕ اِنْ اُرِيْدُ اِلَّا الْاِصْلَاحَ مَا
اسْتَطَعْتُ ؕ وَمَا تَوْفِيْقِيْٓ اِلَّا بِاللّٰهِ ؕ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْهِ اُنِيْبُ

আমি চাই না যে, আমি সেসবের বিপরীত করি যা তোমাদের আমি নিষেধ করি। আমি যতটুকু সম্ভব শুধরাতে চাই। আল্লাহর সাহায্য ছাড়া আমার কোনো সামর্থ্য নেই। আমি তাঁর ওপরই ভরসা করি এবং তার অভিমুখেই আমার প্রত্যাবর্তন। সূরা হুদ ১১ : ৮৮

সুচিপত্র

১. একজন নারী সবার আগে একজন মানুষ ৯

২. পরিত্যাজ্য ভ্রান্ত ধারণাসমূহ ১৭

২.১ আইনী সাক্ষ্য ১৭

২.২ উত্তরাধিকার ২২

২.৩ রক্ত জরিমানা ২৫

২.৪ অভিভাবকত্ব ২৭

২.৫ বিচারিক এবং রাজনৈতিক কার্যক্রম ২৭

৩. নারীর নারীত্ব ২৯

৩.১ একজন নারী তার নারীত্বেই সুন্দর ২৯

৩.২ নারী ও পুরুষের বৈধ মেলামেশার স্বরূপ ৩৫

৩.৩ অনিয়ন্ত্রিত মেলামেশার পক্ষে অনাকাঙ্ক্ষিত বিতর্ক ৪৭

৩.৪ অনাকাঙ্ক্ষিত বিতর্ক পরিহার ৪৮

৪. অবাধ মেলামেশার প্রভাব ৫০

৪.১ নৈতিক অবক্ষয় ৫০

৪.২ অবৈধ সন্তান ৫১

৪.৩ বিয়ে বিমুখতা ৫১

৪.৪ ডিভোর্সের উচ্চহার ও পরিবারে ভাঙ্গন ৫২

৪.৫ মরণব্যাধির প্রসার ৫২

৫. নারী যখন মা ৫৪

৫.১ মাতৃত্ব ৫৪

৫.২ যে মায়েরা অমর হয়ে আছেন ৫৭

৬. নারী যখন কন্যা ৬০

৬.১ ইবনে কুদামা রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর মতামত ৬৭

৭. নারী যখন স্ত্রীর ভুমিকায় ৬৯

৭.১ স্ত্রীর স্বাধীনতা ৭৫

৮. তালাক ৭৬

৮.১ কেন ইসলাম তালাকের সুযোগ দিয়েছে ৭৬

৮.২ তালাকের সুযোগ সীমিতকরণ ৭৮

৮.৩ কখন এবং কীভাবে তালাক সংঘটিত হয় ৮২
৮.৪ তালাক পরবর্তী পরিস্থিতি ৮৩
৮.৫ তালাক কেন পুরুষের দায়িত্বে ন্যাস্ত ৮৬
৮.৬ স্ত্রী কখন ও কীভাবে স্বামীকে তালাক দিতে পারে ৮৭
৮.৭ তালাকের অপব্যবহার ৯০

৯. বহুবিবাহ ৯১
৯.১ প্রাচীনকালের বহুবিবাহ বনাম ইসলামে বহুবিবাহ ৯২
৯.২ বহুবিবাহের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা অপরিহার্য ৯৪
৯.৩ বহুবিবাহের নেপথ্যে প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতা ৯৫
৯.৪ একটি নৈতিক ও মানবিক পন্থা হিসেবে বহুবিবাহ ৯৭
৯.৫ গণহারে যৌন সম্পর্ক অনৈতিক ও অমানবিক ৯৯
৯.৬ বহুবিবাহ প্রথার অপব্যবহার ১০০
৯.৭ বহুবিবাহ বন্ধে পশ্চিমাদের অযাচিত আহবান ১০১
৯.৮ যে ভিত্তিতে ওরা বহুবিবাহকে খারিজ করে ১০১
৯.৯ যার মন্দের পরিমাণ ভালোর চেয়ে বেশি তা ইসলামে অনুমোদন করে না ১০৩
৯.১০ অনুমোদিত বিষয়কে প্রতিরোধ করার অধিসীমা ১০৫

১০. নারী যখন সমাজের গুরুত্বপূর্ণ সদস্যা ১১০
১০.১ নারীর কাজকর্মের বিষয়ে অতিরঞ্জন ও বিভ্রান্তি ১১৫
১০.২ ভ্রান্ত যুক্তি ও ধারণার জবাব ১১৬
১০.৩ কখন একজন নারী কাজ করতে পারবে ১২২

১

একজন নারী সবার আগে একজন মানুষ

রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন ইসলামের বার্তা নিয়ে পৃথিবীতে আসেন তখন সমাজের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নারীকে মানুষ হিসেবে গন্য করা হতো না। সমাজপতিদের কেউ কেউ এ বাস্তবতাকে দেখেও না দেখার ভান করত, আবার কারো কারো পরিস্থিতি মেনে নেয়া ছাড়া কোনো উপায় ছিল না। তবে এটাই সত্য যে, ওই সময়ের বেশিরভাগ মানুষ মনে করতেন, নারীদের জন্মই হয়েছে পুরুষদের সেবা করার জন্য।

ইসলামের আবির্ভাব ও বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে নারীদের জন্য পরিস্থিতি অনুকূল হতে শুরু করে। নারীদের অবস্থান, সম্মান ও মর্যাদা নতুন করে প্রতিষ্ঠিত হয়। ইসলাম নারীদেরকে আল্লাহর হুকুম পালন করার সুযোগ দেয়। আবার নারীদের ওপরও কিছু দায়িত্ব অর্পণ করে যা সঠিকভাবে পালন করলে তারা জান্নাতে যেতে পারবে। ইসলাম নারীকে প্রশংসিত ও সমাজের গুরুত্বপূর্ণ সদস্যা হিসেবে বিবেচনা করে।

মানবজাতির বিকাশে ও মানবসভ্যতা বিনির্মাণে পুরুষের মতো নারীরও সমান অবদান রয়েছে বলে ইসলাম স্বীকৃতি দেয়। নারী ও পুরুষ উভয়েই একই গাছের দুটি শাখা, একই পিতা-মাতার দুই সন্তান। নারী ও পুরুষ সবারই আদি পিতা-মাতা হলেন আদম আলাইহিস সালাম এবং মা হাওয়া আলাইহিস সালাম। নারী ও পুরুষের আদি শিকড় একই। তাদের উভয়কেই ধর্মীয় দায়িত্ব, ইবাদত ও আচারাদি পালন করতে হয় এবং এই আমলের ভিত্তিতে তারা হয় পুরস্কৃত অথবা তিরস্কৃত হবেন। নারী ও পুরুষের শিকড় যেমন এক জায়গায়, তাদের গন্তব্যও একই ঠিকানায়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন :

يَآيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّ خَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَآءً ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِىْ تَسَآءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا ○

হে মানুষ! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় করো, যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এক ব্যক্তি থেকে। যিনি তার থেকে সৃষ্টি করেছেন তার সঙ্গীনীকে এবং তাদের দুজন থেকে ছড়িয়ে দিয়েছেন বহু পুরুষ ও নারী। আর তোমরা ভয় করো আল্লাহকে যিনি তোমাদের একে অপরের কাছে চাওয়া-পাওয়ার

অধিকার দিয়েছেন এবং (ভয় করো) আত্মীয়তার বন্ধন (ছিন্ন করা)কে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের ওপর পর্যবেক্ষক। সূরা আন নিসা ৪ : ১

সকল মানুষ, নারী ও পুরুষ সবাইকে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ প্রথমে একজন মানুষ সৃষ্টি করেছেন, তার থেকেই তার সঙ্গীনীকে এবং তাদের দুজন থেকে বাকি সবাইকে। আল্লাহ অপর এক আয়াতে আরও বলেন :

هُوَالَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ اِلَيْهَا ج

তিনিই সে সত্তা যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন একটি মাত্র সত্তা থেকে। আর তার থেকেই তৈরী করেছেন তার জোড়া, যাতে তার কাছে প্রশান্তি বোধ করে। সূরা আল আরাফ ৭ : ১৮৯

আল্লাহ একটি সত্তা (নাফসুন ওয়াহিদা) থেকে অসংখ্য নারী এবং অসংখ্য পুরুষ সৃষ্টি করেছেন। যারা সবাই এক আল্লাহর ইবাদত করবে। যারা সবাই একই পিতামাতার সন্তান। এ কারণে, সূরা আন-নিসায় আল্লাহ মানুষকে তাগিদ দিয়েছেন যাতে তারা আল্লাহকে ভয় করে। সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের আলোকে আমাদের ওপর যে দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে তা যথাযথভাবে পালন করার জন্যও তিনি আমাদেরকে আদেশ দিয়েছেন।

এ আয়াতগুলো অনুযায়ী নারী ও পুরুষ উভয়েই যুগলবন্দী। তারা প্রত্যেকেই এই সম্পর্কের অবিচ্ছেদ্য অংশ। রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুটো হাদিসে নারীদের বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন, স্ত্রীলোকেরা পুরুষদেরই অংশ। (তিরমিজি ১১৩) এবং নারীরা তো পুরুষের মতোই (আবু দাউদ ২৩৬)।

আল কুরআন নারী ও পুরুষের মধ্যকার এই সমতাকে একাধিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ব্যাখ্যা করেছে। প্রথমত, ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকে কুরআনে আল্লাহ বলেছেন :

اِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَ الْمُسْلِمٰتِ وَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُؤْمِنٰتِ وَ الْقٰنِتِيْنَ وَ
الْقٰنِتٰتِ وَالصّٰدِقِيْنَ وَالصّٰدِقٰتِ وَالصّٰبِرِيْنَ وَالصّٰبِرٰتِ وَالْخٰشِعِيْنَ وَ
الْخٰشِعٰتِ وَ الْمُتَصَدِّقِيْنَ وَ الْمُتَصَدِّقٰتِ وَ الصَّآئِمِيْنَ وَ الصّٰٓئِمٰتِ وَ
الْحٰفِظِيْنَ فُرُوْجَهُمْ وَالْحٰفِظٰتِ وَالذّٰكِرِيْنَ اللّٰهَ كَثِيْرًا وَّالذّٰكِرٰتِ اَعَدَّ
اللّٰهُ لَهُمْ مَّغْفِرَةً وَّاَجْرًا عَظِيْمًا ○

নিশ্চয়ই মুসলিম পুরুষ ও মুসলিম নারী, মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী, অনুগত পুরুষ ও অনুগত নারী, সত্যবাদী পুরুষ ও সত্যবাদী নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ ও ধৈর্যশীল নারী, বিনীত পুরুষ ও বিনীত নারী, দানশীল পুরুষ ও দানশীল নারী, সওম পালনকারী পুরুষ ও সওম পালনকারী নারী, যৌনাঙ্গ হেফাজতকারী পুরুষ ও যৌনাঙ্গ হেফাজতকারী নারী, আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও অধিক স্মরণকারী নারী, এদের জন্য আল্লাহ প্রস্তুত রেখেছেন ক্ষমা ও মহাপ্রতিদান। সূরা আল আহযাব ৩৩ : ৩৫

অন্যদিকে মৌলিক, সামাজিক ও ধর্মীয় দায়বদ্ধতার জায়গা থেকেও কুরআন নারী ও পুরুষের সমতাকে নিশ্চিত করেছে। আল্লাহ বলেন :

وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۘ يَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَيُطِيْعُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ؕ اُولٰٓئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّٰهُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ

মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী একে অপরের বন্ধু যারা ভালোর নির্দেশ করে এবং মন্দ থেকে বিরত রাখে, সলাত কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নির্দেশ অনুযায়ী জীবন যাপন করে। এদের উপর আল্লাহ তায়ালা দয়া করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।
সূরা আত তাওবা ৯ : ৭১

আদম আলাইহিস সালাম-এর সময়ে আল্লাহ যেসব আদেশ নাজিল করতেন, তা আদম আলাইহিস সালাম ও হাওয়া আলাইহিস সালাম উভয়ের জন্যই প্রযোজ্য হতো। আল্লাহ বলেন :

وَ قُلْنَا يٰٓاٰدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَ زَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَ كُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا ۖ وَلَا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ۝

এবং আমরা বললাম, হে আদম! তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস করতে থাক এবং সেখানে যেখান থেকে চাও স্বাচ্ছন্দে আহার করো, কিন্তু এ গাছের নিকটবর্তী হয়ো না। অন্যথায় তোমরা জালিমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।
সূরা আল বাকারা ২ : ৩৫

আল কুরআন এক্ষেত্রে নারীদের প্রতি যে ইহসান করেছে তা লক্ষণীয়। ওল্ড টেস্টামেন্টে আদম আলাইহিস সালামকে প্ররোচিত করে নিষিদ্ধ গাছের ফল খাওয়ানোর দায় চাপানো হয়েছে ইভ-এর ওপর। কিন্তু আল কুরআন বলছে,

এই ঘটনার পুরো দায় হলো শয়তানের। আল্লাহ বলেন :

فَاَزَلَّهُمَا الشَّيْطٰنُ عَنْهَا فَاَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيْهِ ۖ وَ قُلْنَا اهْبِطُوْا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۚ وَلَكُمْ فِى الْاَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَّمَتَاعٌ اِلٰى حِيْنٍ ۝

কিন্তু শয়তান তাদের উভয়কে পদস্খলিত করেছিল। তাই তারা যেখানে ছিল সেখান থেকে তাদের বের হতে হলো এবং আমি বললাম, তোমরা একে অন্যের শত্রুরূপে নেমে যাও পৃথিবীতে, কিছুকালের জন্য তোমাদের বসবাস ও জীবিকা সেখানে। সূরা আল বাকারা ২ : ৩৬

হাওয়া আলাইহিস সালাম একা সেই নিষিদ্ধ গাছের ফল খাননি। এই অন্যায় কাজটি তিনি শুরুও করেননি। ভুলটা তারা দুজনেই করেছিলেন। ফলে তারা দুজনেই অনুতপ্ত হয়েছিলেন এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। কুরআনে সেটাই বর্ণিত হয়েছে :

قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَآ اَنْفُسَنَا ۗ وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ

তারা উভয়ে বলল, হে আমাদের রব! আমরা নিজেদের প্রতি জুলুম করেছি, যদি আপনি আমাদেরকে ক্ষমা না করেন এবং আমাদের প্রতি অনুগ্রহ না করেন তবে আমরা অবশ্যই অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব। সূরা আল আরাফ ৭ : ২৩

এ সম্পর্কে আল কুরআনের আরও কিছু আয়াতও রয়েছে। যেমন :

وَلَقَدْ عَهِدْنَآ اِلٰٓى اٰدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِىَ وَلَمْ نَجِدْ لَهٗ عَزْمًا ۝

আমি তো ইতোপূর্বে আদমের প্রতি নির্দেশ দান করেছিলাম, কিন্তু সে ভুলে গিয়েছিল; আমি তাকে সংকল্পে দৃঢ় পাইনি। সূরা আত ত্বহা ২০ : ১১৫

فَوَسْوَسَ اِلَيْهِ الشَّيْطٰنُ قَالَ يٰٓاٰدَمُ هَلْ اَدُلُّكَ عَلٰى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَ مُلْكٍ لَّا يَبْلٰى ۝ فَاَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْاٰتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفٰنِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَّرَقِ الْجَنَّةِ ۚ وَعَصٰٓى اٰدَمُ رَبَّهٗ فَغَوٰى ۝

এরপর শয়তান তাকে কুমন্ত্রণা দিল এবং বলল, হে আদম! আমি কি তোমাকে বলে দিব অনন্ত জীবনপ্রদ গাছের কথা এবং অবিনশ্বর রাজত্বের কথা? এরপর তারা উভয়েই এর ফল খেয়ে ফেলল, তখন উভয়ের কাছে

> তারা নগ্ন হয়ে গেল এবং তারা জান্নাতের গাছের পাতা দিয়ে নিজেদেরকে আবৃত করতে শুরু করল। আদম তার রবের নির্দেশ অমান্য করেছিল, আর তাই সে পথভ্রষ্ট হলো। সূরা আত ত্বহা ২০ : ১২০-১২১

উপর্যুক্ত আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, দুজনের মধ্যে আগে আদম আলাইহিস সালাম ভুলে গিয়েছিলেন। তিনি অবিচল থাকতে পারেননি এবং শয়তানের কুমন্ত্রনার ফাঁদে তিনিই আগে পড়েছিলেন। তারপর তার সঙ্গে হাওয়া আলাইহিস সালাম একইভাবে পথভ্রষ্ট হন। আর এমনটি যদি ধরেও নেই যে, হাওয়া আলাইহিস সালাম আগে ভুল করেছিলেন, তার দায়ও কিন্তু শুধুমাত্র তার। ওই ভুলের দায় কখনোই তার উত্তরাধিকারী মেয়েদের ওপর বর্তায় না।

শাস্তি, পুরস্কার কিংবা জান্নাতে প্রবেশের যোগ্যতা সম্পর্কে আল্লাহ বলেন :

تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ ۖ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمْ ۖ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

> এরা ছিল অতীতের উম্মত। তারা যা অর্জন করেছে তা তাদের। আর তোমরা যা অর্জন করেছ তা তোমাদের জন্যই। তারা যা করেছে, সে সম্পর্কে তোমাদেরকে প্রশ্ন করা হবে না। সূরা আল বাকারা ২ : ১৩৪ ও ২ : ১৪১

নারী বা পুরুষ যেই হোক না কেন, নেক আমল করলে তারা উভয়েই জান্নাতে যাওয়ার অধিকার রাখে। এ বিষয়টি নিশ্চিত করে আল্লাহ বলেন :

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ ۖ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ ۖ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِندِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ ۝

> এরপর তাদের রব তাদের ডাকে সাড়া দিলেন, আমি তোমাদের কারও পরিশ্রমই বিনষ্ট করি না, তা সে পুরুষ হোক কিংবা নারী। তোমরা একে অপরের অংশ। অতএব, যারা হিজরত করেছে, নিজেদের ঘরবাড়ি হতে বহিষ্কৃত হয়েছে এবং যারা আমার পথে নির্যাতিত হয়েছে আর যারা লড়াই

করেছে ও মৃত্যুবরণ করেছে, আমি অবশ্যই তাদের দোষক্রটি আড়াল করব। এবং তাদের প্রবেশ করাব জান্নাতে যার তলদেশে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত। এ হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রতিদান। আর আল্লাহর কাছে রয়েছে উত্তম প্রতিদান। সূরা আলে ইমরান ৩ : ১৯৫

আল্লাহ রব্বুল আলামীন আরও বলেন :

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۚ وَ لَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝

যে মুমিন হয়ে আমলে সলেহ করবে, সে পুরুষ হোক কিংবা নারী, আমি তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং তারা যা করত সেসবের তুলনায় অবশ্যই আমি তাদেরকে উত্তম প্রতিদান দেবো। সূরা আন নাহল ১৬ : ৯৭

সম্পদ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ইসলাম অনেক বেশি ইনসাফ করেছে। বিভিন্ন ধর্ম ও জাতি যেভাবে নারীদের মালিকানা ও উত্তরাধিকারী হিসেবে সম্পদ পাওয়ার অধিকারকে বিনষ্ট করেছে এবং নিজেদের আওতাধীন সম্পদগুলো নিয়ন্ত্রণ ও ভোগের ক্ষেত্রে নারীদের ওপর প্রতিবন্ধকতা তৈরি করেছে, ইসলাম তা পরিবর্তন করে দিয়েছে।

ইসলাম নারীদেরকে সব ধরনের মালিকানার অধিকার প্রদান করেছে। অর্থ ব্যয় করার সুযোগ দিয়েছে এবং নিজের অর্থ সুরক্ষারও অধিকার দিয়েছে। ইসলাম নারীদের উত্তরাধিকার, ক্রয়-বিক্রয়, ভাড়া প্রদান, দান করা, ঋণ গ্রহণ, ঋণ প্রদান ও সদাকার জন্য সম্পদ বরাদ্দ করা, সম্পদ হস্তান্তর এবং বন্ধক কিংবা যেকোনো ধরনের চুক্তি সম্পাদন করার অধিকার প্রদান করেছে।

শিক্ষা ও জ্ঞান অর্জন করা নারীদের মৌলিক অধিকার। ইসলামও নারীদেরকে এই অধিকার প্রদান করেছে। শুধু তাই নয়, ইসলাম নারীদের জন্য জ্ঞান অর্জনকে বাধ্যতামূলক করে দিয়েছে। রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য ফরজ।' এখানে লক্ষণীয় হলো, তিনি নারী ও পুরুষ আলাদা করে কথাটি বলেননি। প্রত্যেক মুসলিমের কথা বলা হয়েছে। অতএব, এখানে নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্য একই ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণের সুযোগ উন্মোচিত হয়েছে।

একজন পুরুষকে যেভাবে ধর্মীয় আচারাদি ও নির্দেশনা মান্য করতে হয়, নারীদের জন্যও ঠিক একই রকমের বিধান প্রযোজ্য। সলাত, সওম, হজ্জ, যাকাত কিংবা

অন্যসব ইবাদত নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্যই বাধ্যতামূলক, যা তাদেরকে নিজেদের সাধ্য ও সামর্থ্যের আলোকে বাস্তবায়ন করে যেতে হয়। আর আমলকে বিবেচনায় নেয়ার ক্ষেত্রেও আল্লাহ নারী ও পুরুষকে একইভাবে বিবেচনা করবেন। অর্থাৎ যেভাবে তিনি একজন পুরুষের ইবাদতের মানকে যাচাই করবেন, ঠিক একই নিয়মে নারীদের ইবাদতকেও তিনি মূল্যায়ন করবেন। এক্ষেত্রেও কোনো ধরনের পার্থক্য বা বৈষম্য করা হবে না।

নারীরা তাদের সামাজিক দায়বদ্ধতাও এড়িয়ে যেতে পারে না। আল্লাহ বলেন :

وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۘ يَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَيُطِيْعُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ؕ اُولٰٓئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّٰهُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ

> আর মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী একে অপরের বন্ধু। যারা ভালো কথার নির্দেশ করে এবং মন্দ থেকে বিরত রাখে, সলাত প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নির্দেশ অনুযায়ী জীবনযাপন করে। এদেরই ওপর আল্লাহ তায়ালা দয়া করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশীল, প্রজ্ঞাময়।
>
> সূরা আত তাওবা ৯ : ৭১

উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, একজন নারী যেকোনো আশ্রয়হীন মানুষকে আশ্রয় দিতে পারে। তবে এক্ষেত্রে কোনো ধরনের অবমাননাকর আচরণ করার সুযোগ নেই। বরং, প্রতিটি কাজ ও পদক্ষেপ হতে হবে সম্মানজনক ভাবে।

এ বিষয়টি প্রমাণিত হয় উম্মে হানি বিনতে আবু তালিব রদিয়াল্লাহু আনহা-র একটি ঘটনায়। তিনি মক্কা বিজয়ের দিন একজন অসহায় ব্যক্তিকে আশ্রয় দেন। লোকটি মুর্তিপূজারি হওয়ায় তার ভাই ওই ব্যক্তিকে হত্যা করতে চেয়েছিল। উম্মে হানি রদিয়াল্লাহু আনহা রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে অভিযোগ করেন, হে রসূল! আমি আশ্রয় দিয়েছি এমন একজন ব্যক্তিকে (ইবনে হুবায়রা) যাকে আমার সহোদর হত্যা করতে চায়। রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তুমি যাকে আশ্রয় দিয়েছ আমরা তাকে নিরাপত্তা দিয়ে যাব। মূল হাদিসটি হচ্ছে :

> উম্মু হানি বিনতু আবু তালিব রদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মক্কা বিজয়ের বছর আল্লাহর রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহ ওয়া সাল্লাম এর নিকট গিয়ে দেখলাম যে, তিনি গোসল করছেন আর তাঁর মেয়ে ফাতিমা

রদিয়াল্লাহু আনহা তাঁকে আড়াল করে রেখেছেন। তিনি বলেন, আমি তাঁকে সালাম প্রদান করলাম। তিনি জানতে চাইলেন, এ কে? আমি বললাম, আমি উম্মু হানি বিনতু আবু তালিব। তিনি বললেন মারহাবা, হে উম্মু হানি!

গোসল শেষ করে তিনি এক কাপড় জড়িয়ে আট রাকআত সলাত আদায় করলেন। সলাত শেষ করলে তাঁকে আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমার সহোদর ভাই (আলী ইব্‌নু আবু তালিব রদিয়াল্লাহু আনহু) এক ব্যক্তিকে হত্যা করতে চায়, অথচ আমি তাকে আশ্রয় দিয়েছি। ওই ব্যক্তি হুবায়রার ছেলে অমুক। তখন আল্লাহর রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হে উম্মু হানি! তুমি যাকে নিরাপত্তা দিয়েছ, আমিও তাকে নিরাপত্তা দিলাম। উম্মু হানি রদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, এ সময় ছিল চাশতের ওয়াক্ত।

বুখারী ৮ : ৩৫৭, মুসলিম ৩ : ৩৩৬, আল লুলু ওয়াল মারজান ১৯৩

২

পরিত্যাজ্য ভ্রান্ত ধারণাসমূহ

ইসলাম যেভাবে নারীকে সবার আগে একজন মানুষ হিসেবে গণ্য করে তা নিয়ে কিছু ব্যক্তির মনে বেশ সংশয় ও সন্দেহ দেখা যায়। এ ধরনের বেশ কিছু প্রশ্নের উত্তর আমরা এবার খুঁজতে চেষ্টা করব।

যে প্রশ্নটি খুব বেশি শুনা যায় তাহলো, ইসলাম কী আসলেই নারীকে মানুষ হিসেবে ততটা মূল্যায়ন করে যতটা একজন পুরুষকে মূল্যায়ন করে? কিছু কিছু বিষয় বিশেষত আইনী সাক্ষ্য, উত্তরাধিকার, রক্তঋণ, পরিবারের দায়িত্ব, রাষ্ট্র পরিচালনাসহ বিভিন্ন বিষয়ে ইসলাম কী নারীদের তুলনায় পুরুষকে বেশি সুবিধা দেয় না?

এজন্য নয় যে, আল্লাহ তায়ালা কাউকে অন্যের চেয়ে বেশি অগ্রাধিকার দিয়েছেন। নারী ও পুরুষ উভয়ের রব একজনই। নারী বা পুরুষ উভয়ের জন্যই আল্লাহর কাছে অগ্রাধিকার পাওয়ার বা বিশেষ সুবিধা পাওয়ার একটি মাত্র উপায় রয়েছে। আর তাহলো তাকওয়া। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ সুবহানুতায়ালা বলেন :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَٰكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَٰكُمْ شُعُوبًا وَقَبَآئِلَ
لِتَعَارَفُوٓا۟ ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝

হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা পরস্পর পরিচিত হতে পারো। নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে সেই সর্বাধিক সম্ভ্রান্ত যে সর্বাধিক তাকওয়া অবলম্বনকারী। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সম্যক অবহিত।

সূরা আল হুজরাত ৪৯ : ১৩

তাই পার্থক্য যদি থেকেও থাকে, তা হলো অর্পিত দায়িত্ব কে কীভাবে পালন করছে তার ওপর। অন্য কোনো বিষয় বিবেচনার কোনো সুযোগ এখানে নেই।

২.১ আইনী সাক্ষ্য

কুরআনের যে আয়াতে আল্লাহ সাক্ষ্য দেয়ার বিষয়টি তুলে ধরেছেন, সেটি বেশ বড়। তবে, সংশ্লিষ্ট অংশটি হলো :

وَٱسْتَشْهِدُوا۟ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ۖ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ

وَّ امۡرَاَتٰنِ مِمَّنۡ تَرۡضَوۡنَ مِنَ الشُّهَدَآءِ اَنۡ تَضِلَّ اِحۡدٰىهُمَا فَتُذَكِّرَ اِحۡدٰىهُمَا الۡاُخۡرٰى ؕ وَلَا يَاۡبَ الشُّهَدَآءُ اِذَا مَا دُعُوۡا ؕ

দুজন সাক্ষী করো, তোমাদের পুরুষদের মধ্যে থেকে। যদি দুজন পুরুষ না হয়, তবে একজন পুরুষ ও দুজন মহিলা। ঐ সাক্ষীদের মধ্য থেকে যাদের তোমরা পছন্দ করো যাতে তাদের একজন ভুল করলে অন্যজন স্মরণ করিয়ে দেয়। যখন তাদের ডাকা হয়, তখন সাক্ষীরা অস্বীকার করবে না। সূরা বাকারা ২ : ২৮২

এ আয়াতের মাধ্যমে আল কুরআন সাক্ষী হিসেবে একজন পুরুষের বিকল্প দুজন নারীকে রাখার বিধান জারি করেছে। এর বাইরে অনেক বড় বড় শিক্ষাবিদ ও বিশ্লেষক মনে করেন, গুরুতর অপরাধের সাক্ষী হিসেবে নারীদেরকে বিবেচনা করার সুযোগ নেই। যদিও তাদের এ ধরনের চিন্তাধারার সঙ্গে কুরআনের উপর্যুক্ত আয়াতের কোনো সম্পর্ক নেই।

এ আয়াতে যতটুকু পার্থক্য রাখা হয়েছে, তা মানুষ হিসেবে নারীদেরকে হেয় করার জন্য নয়। নারীদের সংহতি ও ভাবমর্যাদাকে প্রশ্নবিদ্ধ করার জন্যও নয়। বরং প্রকৃতিগতভাবে নারীর যে মানসিকতা ও কর্মক্ষেত্র, বিশেষত মাতৃত্ব ও সংসার পরিচালনা, তাতে যেন নারীরা বেশি মনোযোগ প্রদান করতে পারে, এই উদ্দেশ্যেই এমনটা করা হয়েছে।

তাছাড়া, নারীরা এ ধরনের কাজে আসতে গেলে চারিত্রিকভাবে কিছুটা প্রশ্নবিদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। আর এ কারণেই, আল্লাহ ঋণদাতা ও গ্রহীতাকে নিজেদের ঋণের বিষয়টি স্বচ্ছ রাখার জন্য দুজন পুরুষ অথবা একজন পুরুষ আর দুজন নারীকে রাখার বিধান করে দিয়েছেন। কুরআন এ কথা স্পষ্টতই বলেছে যে, 'একজন যদি ভুলে যায়, তবে অপরজন তাকে স্মরণ করিয়ে দেবে।'

আর যেসব স্কলার গুরুতর অপরাধ যেমন, খুন বা এ জাতীয় কোনো অপরাধের সাক্ষ্যগ্রহণ প্রক্রিয়া থেকে নারীকে বিরত রাখতে বলেছেন তার কারণ, তারা নারীকে এ ধরনের অপরাধস্থল থেকে দূরে রাখার জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা করেছেন। কেননা, এ জাতীয় পরিস্থিতিতে নারীরা মানসিকভাবে আঘাত পেতে পারেন, তাদের সম্মান ও আব্রুর ওপরও অযাচিত হামলা হতে পারে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, অনেক নারী রক্ত দেখে ভয় পান। সে হয়ত কোথাও কোনো একটি খুন বা রক্তপাত দেখে চোখ বন্ধ করে ফেলল অথবা দৌড়ে পালিয়ে গেল। সেক্ষেত্রে সাক্ষী হিসেবে ঘটনা সম্পর্কে একটি সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ বিবরণ দেয়া তার জন্য বেশ কঠিন।

পক্ষান্তরে, নারীদের সাক্ষ্যকে নারী বিষয়ক বিভিন্ন ঘটনাবলী নির্ধারণে অনেক বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়। বিশেষ করে সন্তান প্রতিপালনে সৎ মায়ের ভুমিকা, ঋতুচক্র, সন্তান প্রসব প্রভৃতি বিষয়ে সেই অতীত যুগ থেকেই নারীদের জ্ঞান বেশি ছিল এবং আজও এ সব বিষয়ে তারাই বেশি ধারণা রাখেন।

অন্যদিকে বেশ কিছু ইসলামী আইনজ্ঞ মনে করেন যে, নারীদের বিভিন্ন আয়োজনে, যেগুলোতে পুরুষদের যাওয়ার সুযোগ নেই, যেমন নারীদের কোনো বৈঠক, বিয়ে-শাদি অথবা অন্য কোনো সামাজিকতার মধ্যে যদি কোনো অপরাধ ঘটে যায় তাহলে সেক্ষেত্রেও নারীদের সাক্ষ্যকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হবে।

যারা বলছেন, গুরুতর অপরাধের ক্ষেত্রে মেয়েদের সাক্ষ্যকে গ্রহণ করা যাবে না, সকল পরিস্থিতির জন্য তাদের এ অভিমতকে মেনে নেয়ার সুযোগ নেই। কারণ, এক জায়গায় একটি খুন হয়েছে, একজন মহিলা কোনো কারণে অপর এক মহিলাকে হত্যা করে ফেলেছে, আর এই এ ঘটনার সাক্ষীও একজন মহিলা। তাহলে কী শুধু মহিলা হওয়ার কারণে আপনি তার সাক্ষ্যকে অগ্রাহ্য করতে পারবেন, কিংবা গুরুতর অপরাধ হওয়ায় একজন পুরুষকে ডেকে নিয়ে আসবেন যে কিনা ঘটনা না দেখেও তার সম্পর্কে সাক্ষ্য দিয়ে যাবেন? এটা কী আদৌ হওয়া উচিত। বরং বাস্তবতার দাবি হলো, এ ধরনের পরিস্থিতিতে যে নারী ঘটনাটি প্রত্যক্ষভাবে দেখেছেন তার সাক্ষ্যকে গ্রহণ করা উচিৎ যদি সে সৎ, যথার্থ এবং সত্যবাদি হয়। আর এটা আলাদা করে নারীর জন্য নয়, বরং সকল সাক্ষীর জন্যই এ গুণগুলো থাকা আবশ্যক।

সূরা আল বাকারার উপর্যুক্ত আয়াতে, যদি দুজন পুরুষ না হয়, তবে একজন পুরুষ ও দুজন মহিলাকে সাক্ষী হিসেবে নিয়ে আসার কথা বলা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবীণ শিক্ষাবিদ মাহমুদ শালতুত বলেন :

এ আয়াতে ভাবমূর্তি বা মর্যাদা সম্পর্কে কিছু বুঝানো হয়নি। এখানে বরং লেনদেনের সময়ে ব্যক্তিবিশেষের অধিকারের বিষয়ে যথার্থতা এবং আত্মবিশ্বাস তৈরি হওয়ার প্রক্রিয়া সম্পর্কে একটি যৌক্তিক অবস্থান নেয়া হয়েছে। শুরু হয়েছে এভাবে :

> হে মুমিনগণ! যখন তোমরা কোন নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে ঋণের আদান-প্রদান করো, তখন তা লিপিবদ্ধ করে নাও এবং তোমাদের মধ্যে কোনো লেখক ন্যায়সঙ্গতভাবে তা লিখে দেবে; লেখক লিখতে অস্বীকার করবে না। আল্লাহ তাকে যেমন শিক্ষা দিয়েছেন, তার উচিত তা লিখে দেয়া। এবং ঋণ গ্রহীতা যেন লেখার বিষয় বলে দেয় এবং সে যেন স্বীয় রব আল্লাহকে ভয় করে এবং

> লেখার মধ্যে বিন্দুমাত্রও কম-বেশি না করে। এরপর ঋণগ্রহীতা যদি নির্বোধ হয় কিংবা দুর্বল হয় অথবা নিজে লেখার বিষয়বস্তু বলে দিতে অক্ষম হয়, তবে তার অভিভাবক ন্যায়সঙ্গতভাবে লিখিয়ে নেবে। তোমাদের পুরুষদের মধ্যে থেকে দুজন সাক্ষী করো। যদি দুজন পুরুষ না হয়, তবে একজন পুরুষ ও দুজন মহিলা। ঐ সাক্ষীদের মধ্য থেকে যাদেরকে তোমরা পছন্দ করো যাতে একজন যদি ভুলে যায়, তবে একজন অন্যজনকে স্মরণ করিয়ে দেবে।
>
> সূরা আল বাকারা ২ : ২৮২

এটুকু পড়লে বোঝা যায় এখানে যথার্থতা, গ্রহণযোগ্যতা এবং অধিকার নিয়েই কথা বলা হয়েছে, কারও বিচারিক যোগ্যতা বা গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়নি। এখানে তথ্য লিপিবদ্ধ রাখা এবং তথ্য ভালোভাবে যাচাই করতে বলা হয়েছে, যাতে সংশ্লিষ্ট সকলের সর্বোচ্চ পরিমাণ নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়।

এর মানে এই নয় যে, পুরুষদের সাক্ষ্য ছাড়া একজন নারী বা একদল নারীর সাক্ষ্য কখনোই বিবেচনায় নেয়া হবে না। কেননা বিচারের ক্ষেত্রে সবসময়ই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টি রয়েছে তাহলো তথ্য প্রমাণ।

একই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ইবনুল কাইয়্যিম রহমাতুল্লাহি আলাইহি পৃথকভাবে ইসলামের সাক্ষ্যপ্রমাণ বিষয়ক বিধানগুলো চিহ্নিত করেছেন যা প্রচলিত সাক্ষ্য ব্যবস্থার চেয়ে অনেক বেশি সংহত ও সঙ্গতিপূর্ণ। তার প্রবর্তিত তত্ত্বানুযায়ী অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য 'সাক্ষ্য প্রমাণকেই' সবচেয়ে জরুরি বিষয় হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। যে বিষয়টি তথ্য প্রমাণের ভিত্তিতে স্পষ্ট হয়ে ওঠে তাকেই বিবেচনায় নেয়া হবে। আর বিচারকও নির্ভরযোগ্য তথ্য-প্রমাণের ভিত্তিতেই তার রায় প্রদান করবেন। এমনকি অমুসলিমের সাক্ষ্যকেও বিবেচনায় নেয়া হবে যদি তার বিশ্বস্ততা নিয়ে কোনো সংশয় না থাকে।

এ বাস্তবতার প্রেক্ষিতে দুজন নারীর সাক্ষ্যকে একজন পুরুষের সমান বিবেচনা করার সুযোগ তৈরি হয় বলে শায়খ শালতুত মনে করেন। তবে, নারীদের দুর্বলতা বা মানসিক কোনো অযোগ্যতার কারণে এমনটা হয়েছে তা নয়।

এ আয়াত যখন নাজিল হয়েছিল, তখন সেই সময়ের বাস্তবতাকে বিবেচনায় নেয়া হয়েছিল। আর ঘটনাচক্রে, এখনো অধিকাংশ নারীর ক্ষেত্রেই বাস্তবতা তেমনই আছে। নারীরা অনেক ক্ষেত্রেই এখন ঋণ নিবন্ধন প্রক্রিয়া ও লেনদেনের সময় উপস্থিত থাকেন না। যদিও কিছু কিছু বাস্তবতায় প্রয়োজনের তাগিদেই কিছু নারীকে এ জাতীয় অনেক ঘটনার সময় সম্পৃক্ত হতে হয়। এত কিছুর পরও এ সত্য এড়িয়ে যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই যে, মা এবং সন্তান জন্ম দেয়ার ক্ষমতাই নারীদের সবচেয়ে বড় যোগ্যতা।

আর কুরআনের উপর্যুক্ত আয়াতে বারবার তথ্যের যথার্থতার ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। কোনো কোনো দেশে লেনদেন ও ঋণ লিপিবদ্ধ করার কাজটি নারীরাই করে থাকে। এমতাবস্থায়, এসব কাজে যদি কোনো বিষয়ে সাক্ষ্য গ্রহণের প্রয়োজন হয় তাহলে অবশ্যই নারীদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা যাবে। আর সেই দেশের সমাজ ও বাস্তবতা যদি নারী ও পুরুষের গ্রহণযোগ্যতার ওপর সমান আস্থা রাখতে পারে তাহলে নারী ও পুরুষের সাক্ষ্যের মানকেও তারা একই মানসম্পন্ন হিসেবেও বিবেচনা করতে পারে।

শায়খ শালতুত এতটুকু বলেই ক্ষান্ত হননি। তিনি একটি মামলার উদাহরণও টেনে এনেছেন যেখানে নারী ও পুরুষের সাক্ষ্যকে একই রকম মূল্যায়ন করা হয়েছে।

কুরআনের অপর এক আয়াতে সমতার একটি স্পষ্ট প্রমাণ আছে যেখানে সাক্ষী হিসেবেও নারী ও পুরুষের সমান সুযোগ ও মূল্যায়ন নিশ্চিত করা হয়েছে। বিশেষ করে, সেক্ষেত্রে যেখানে স্বামী-স্ত্রী একে অপরকে পরকীয়া বা ব্যভিচারের জন্য দোষারোপ করে এবং ঘটনার একমাত্র সাক্ষী থাকে তাদেরই একজন, তখন সাক্ষী হিসেবে নারী ও পুরুষ একই মর্যাদা ও গুরুত্ব পাবে। কুরআনে বলা হয়েছে :

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ اَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ شُهَدَآءُ اِلَّآ اَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ اَحَدِهِمْ اَرْبَعُ شَهٰدٰتٍۭ بِاللّٰهِ ۙ اِنَّهٗ لَمِنَ الصّٰدِقِيْنَ - وَالْخَامِسَةُ اَنَّ لَعْنَتَ اللّٰهِ عَلَيْهِ اِنْ كَانَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ - وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذَابَ اَنْ تَشْهَدَ اَرْبَعَ شَهٰدٰتٍۭ بِاللّٰهِ ۙ اِنَّهٗ لَمِنَ الْكٰذِبِيْنَ - وَالْخَامِسَةَ اَنَّ غَضَبَ اللّٰهِ عَلَيْهَآ اِنْ كَانَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ○

কোনো স্বামী যদি তার স্ত্রীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে এবং তারা নিজেরা ছাড়া তাদের কোনো সাক্ষী না থাকে এরূপ ব্যক্তির সাক্ষ্য এভাবে হবে যে, সে আল্লাহর কসম খেয়ে চারবার সাক্ষ্য দেবে যে, সে সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত। আর পঞ্চমবারে সাক্ষ্য দেবে যে, সে যদি মিথ্যাবাদী হয় তাহলে নিশ্চয়ই তার ওপর আল্লাহর লানত। এর বিপরীতে স্ত্রীর শাস্তি রহিত হয়ে যাবে যদি সে আল্লাহর কসম খেয়ে চারবার সাক্ষ্য দেয় যে, তার স্বামী অবশ্যই মিথ্যাবাদী। কিন্তু যদি কোনো স্ত্রী পঞ্চমবারও স্বামীর বিরুদ্ধে বলে অথচ যদি তার স্বামী সত্য বলে থাকে তাহলে তার নিজের ওপর আল্লাহর গযব নেমে আসবে।
সূরা আন নূর ২৪ : ৬-৯

অর্থাৎ যদি কোনো স্বামী চারবার সাক্ষ্য দেয় তাহলে সে মিথ্যা বললে আল্লাহ

যেমন ওই ব্যক্তির ওপর ক্রোধান্বিত হন, ঠিক তেমনি, যদি কোনো নারী চারবারই সেই অভিযোগ অস্বীকার করে সাক্ষ্য দেয়, তাহলে তার বক্তব্যও একইভাবে মুল্যায়িত হবে। কিন্তু যদি সে মিথ্যা বলে, তাহলে তার ওপর আল্লাহর গযব বর্ষিত হবে। এ ধরনের ঘটনার ক্ষেত্রে সত্য সাক্ষ্য দেয়ার মূল্যায়ন কিংবা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়ার পরিণাম নারী ও পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রে একই রকম হবে।

২.২ উত্তরাধিকার

আল্লাহ্ তায়ালা সরাসরি আয়াত নাজিলের মাধ্যমে উত্তরাধিকারী হিসেবে নারী ও পুরুষের প্রাপ্যতার ক্ষেত্রে ভিন্নতা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আল্লাহ্ বলেন :

يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِيْٓ اَوْلَادِكُمْ ۚ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ ۝

> আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের সন্তানদের সম্পর্কে আদেশ করেন যে, একজন পুরুষের অংশ দুজন নারীর অংশের সমান। সূরা আন নিসা ৪ : ১১

শরীয়া নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্য আলাদা আলাদা কাজ ও করণীয় নির্ধারণ করে দিয়েছে। তাই প্রত্যেকের নির্ধারিত কাজগুলো করার জন্য যতটুকু প্রাপ্যতা যুক্তিযুক্ত শরীয়া সে দৃষ্টিভঙ্গির আলোকেই সম্পদ বরাদ্দ করেছে।

উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, একজন লোক তার ছেলে ও মেয়েকে রেখে ইন্তেকাল করলেন। ছেলেটি কিছুদিন পর বিয়ে করল। বিয়ের সময় সে মোহরানা পরিশোধ করল এবং বিয়ের পর স্ত্রীকে নিয়ে একসঙ্গে বসবাস করতে লাগল। ছেলেটিকে স্ত্রীসহ গোটা পরিবারের খরচও জোগাড় করতে হবে।

অন্যদিকে, বোনের যখন বিয়ে হয়ে যায়, সে স্বামীর কাছ থেকে মোহরানা পেল। স্বামীর সংসারে চলে যাওয়ার পর স্বামী তার যাবতীয় ভরণ-পোষণের দায়িত্ব পালন করে। স্ত্রীর হাতে যদি বিপুল অর্থ সম্পদ থাকে, তথাপিও সাংসারিক এ কাজগুলোর পেছনে তার এক টাকাও খরচ করার কোনো অপরিহার্য দায় নেই। সে করতে পারে। তবে, শরীয়া মূল দায়িত্বটি দিয়ে রেখেছে স্বামীর ওপর। স্ত্রী ধনী হোক বা গরিব হোক, তাকে তার স্বামীর আর্থিক সামর্থ্যের আলোকেই জীবন যাপন করতে হবে, এটাই বাস্তবতা। আল্লাহ্ বলেন :

لِيُنْفِقْ ذُوْ سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهٖ ؕ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهٗ فَلْيُنْفِقْ مِمَّآ اٰتٰىهُ اللّٰهُ ؕ لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا مَآ اٰتٰىهَا ؕ سَيَجْعَلُ اللّٰهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُّسْرًا ۝

বিত্তশালী ব্যক্তি তার বিত্ত অনুযায়ী ব্যয় করবে। যে ব্যক্তি সীমিত পরিমাণে রিযিকপ্রাপ্ত, সে আল্লাহ যা দিয়েছেন, তা থেকে ব্যয় করবে। আল্লাহ যাকে যা দিয়েছেন, তার চেয়ে বেশী ব্যয় করার আদেশ কাউকে করেন না।

সূরা আত ত্বলাক ৬৫ : ৭

বিষয়টিকে আরো সহজ করেও বলা যায়। ধরা যাক, একজন পিতা মৃত্যুর সময় দেড় লাখ টাকা রেখে গেলেন। তাহলে তার ছেলে পাবে ১ লাখ টাকা, আর মেয়ে পাবে ৫০ হাজার টাকা। ছেলেটিকে এই টাকা থেকেই বিয়ের মোহরানা, বাসা ভাড়া শোধ করতে হবে। বাসার সাজসজ্জার খরচও এখান থেকেই দিতে হবে। অন্যদিকে মেয়েটির হাতে তো ৫০ হাজার টাকা থাকছেই। তারপর আবার বিয়ের পর যোগ হবে মোহরানা এবং বিয়েতে প্রাপ্ত উপহার সামগ্রী। তাহলে তার হাতে সবমিলিয়ে অনেকটা সম্পদই থেকে যায়।

শুধু তাই নয়, পরিবার যখন বড় হয়, সন্তানাদি হয়, তখন পুরুষ তথা স্বামী বা পিতার দায় আরও বাড়তে থাকে। কারো কারো সংসারে তো বৃদ্ধ পিতামাতাকেও সঙ্গে রাখতে হয়। আবার এমনও অনেক ছেলে আছে, যার সংসারে তার নিজের বা স্ত্রীর ছোট ভাই-বোনকেও সঙ্গে রাখতে হয়, যারা উপার্জনক্ষম নয়। পাশাপাশি, দুবর্ল আত্মীয়স্বজন ও আশপাশের অসহায় মানুষগুলোর প্রতিও খেয়াল রাখতে হয়। অন্যদিকে, একজন নারীর জন্য ইসলাম এসব কোনো কার্যক্রমকেই বাধ্যতামূলক করে দেয় না। তবে তিনি চাইলে উত্তম চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে এবং নিজের আমলনামা সমৃদ্ধ করার জন্য উত্তম আমল করে যেতে পারেন।

আবার সবক্ষেত্রেই যে নারীরা পুরুষের অর্ধেক সম্পত্তি উত্তরাধিকার হিসেবে পাবেন তাও কিন্তু নয়। কখনো কখনো তারা পুরুষদের সমপরিমাণ সম্পত্তিই পায়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, পিতা-মাতা যখন সন্তানের সম্পদ থেকে কিছু পায় তখন তারা একই পরিমাণে পাবেন। আল্লাহ বলেন :

وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ

মৃতের পিতা-মাতার মধ্য থেকে প্রত্যেকের জন্যে ত্যাজ্য সম্পত্তির ছয় ভাগের এক ভাগ, যদি মৃতের পুত্র থাকে।

সূরা আন নিসা ৪ : ১১

এখানে একই সমান দেয়ার কারণ হলো, অনেক ক্ষেত্রে পিতা ও মাতার প্রয়োজন একইরকম থাকে।

আবার যদি কোনো ভাই তার মৃত ভাইয়ের সম্পত্তি পায়, আর সেই মৃত ভাইটির

যদি কোনো সন্তানাদি বা পিতামাতা না থাকে তা হলে কী হবে? সেক্ষেত্রে কুরআন বলছে :

وَ اِنْ كَانَ رَجُلٌ يُّوْرَثُ كَلٰلَةً اَوِ امْرَاَةٌ وَّلَهٗۤ اَخٌ اَوْ اُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَاِنْ كَانُوْۤا اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ فِي الثُّلُثِ مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصٰى بِهَاۤ اَوْ دَيْنٍ ۙ

যে পুরুষের মিরাস, তার যদি পিতা-মাতা,সন্তান কিংবা স্ত্রী না থাকে এবং এক ভাই কিংবা এক বোন থাকে, তবে উভয়ের প্রত্যেকে ছয় ভাগের এক ভাগ পাবে। আর যদি ততোধিক থাকে, তবে উভয়ের প্রত্যেকে অসিয়ত পূরণ ও ঋণ পরিশোধের পর তারা এক তৃতীয়াংশের সম অংশীদার হবে।

সূরা আন নিসা ৪ : ১২

ফলে, এক্ষেত্রে মায়ের অংশ থেকে ভাই ও বোন উভয়েই ছয় ভাগের এক ভাগ পাবে। আর যদি দুজনের বেশি ভাইবোন থাকে তাহলে তারা উভয়েই সমান পরিমাণ অর্থাৎ তিনভাগের এক ভাগ সম্পত্তি পেয়ে যাবে। এসবগুলো বিধান একসঙ্গে পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে সমতা সর্বক্ষেত্রেই নিশ্চিত করা হয়েছে।

আরও উল্লেখ্য, এমন কিছু সময় আছে যখন নারীরা শুধু পুরুষদের সমান নয় বরং আরো বেশি পেয়ে থাকেন। যেমন, যদি কোনো স্ত্রী তার মা, দুই ভাই এবং এক বোন রেখে মারা যান, তাহলে বোন একাই ওই মহিলার রেখে যাওয়া সম্পত্তির ছয় ভাগ পেয়ে যাবেন। অথচ দুই ভাই মিলে পাবেন ছয় ভাগের এক ভাগ মাত্র।

অপরদিকে, যদি কোনো মহিলা তার স্বামী, বোন এবং ভাই রেখে যান, তাহলে স্বামী পাবে সম্পদের অর্ধেক আর বোন পাবে বাকি অর্ধেক। আর সৎ ভাই থাকলে তারা ন্যূনতম কিছু হয়ত পেতে পারে। কিন্তু সৎ বোন থাকলে সেও সম্পদের ছয় ভাগের এক ভাগ পাবে।

আরেক সময়েও নারী পুরুষের থেকে বেশি পায়। সূরা নিসার আয়াত ১-এ বলা হয়েছে, যদি পুত্র না থাকে এবং পিতা-মাতাই ওয়ারিস হয়, তবে মাতা পাবে তিন ভাগের এক ভাগ। এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ইবনে আব্বাস রদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, যদি কোনো নারী এ অবস্থায় মারা যায় যে, তার স্বামী এবং পিতা-মাতা দুজনই জীবিত আছেন, তাহলে স্বামী পাবেন সম্পদের অর্ধেক, মা পাবেন

সম্পদের তিন ভাগের এক ভাগ আর পিতা পাবেন ছয় ভাগের এক ভাগ।

ইবনে হাজম রহমাতুল্লাহি আলাইহি-সহ আরও অনেক ফকীহ-র মতামত পর্যালোচনা করে ইবনে আব্বাস রদিয়াল্লাহু আনহুর এই ব্যাখ্যার বিষয়ে বলেন, আল্লাহ কখনোই পিতাকে মায়ের থেকে বেশি সুবিধাপ্রাপ্ত অবস্থায় দেখতে চান না। অন্য আরও যেসব সাহাবী ইবনে আব্বাস রদিয়াল্লাহু আনহুর দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে একমত পোষণ করেছেন তাদের মধ্যে আছেন উমার রদিয়াল্লাহু আনহু, উসমান রদিয়াল্লাহু আনহু এবং যায়েদ বিন সাবিত রদিয়াল্লাহু আনহু। যেসব তাবেয়ী এই চিন্তা লালন করেছেন তার মধ্যে আছেন, আল হাসান রহমাতুল্লাহি আলাইহি, ইবনে সিরিন রহমাতুল্লাহি আলাইহি এবং আলী নকী রহমাতুল্লাহি আলাইহি। আর ফকীহগণের মধ্যে আছেন ইমাম আবু হানিফা রহমাতুল্লাহি আলাইহি, ইমাম মালিক রহমাতুল্লাহি আলাইহি এবং ইমাম শাফেয়ী রহমাতুল্লাহি আলাইহি।

২.৩ রক্ত জরিমানা

রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে নির্ভরযোগ্য কোনো হাদিস পাওয়া যায়নি কিংবা ধর্মীয় বিশেষজ্ঞদের কোনো মতামতও পাওয়া যায়নি যেখানে এ কথা বলা হয়েছে যে, নারীদেরকে হত্যা করা হলে যে আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেয়া হবে, তা পুরুষ হত্যাকান্ডের আর্থিক ক্ষতিপূরণের অর্ধেক। এরকম মাত্র দুটি হাদিস আছে, যার নির্ভরযোগ্যতা নিয়ে সংশয় আছে। যথার্থতা বা গ্রহণযোগ্যতার দিক থেকে তুলনামূলকভাবে সবচেয়ে বেশি সমর্থন পাওয়া যায় যে হাদিসটি নিয়ে তা লিপিবদ্ধ রয়েছে সুনানে নাসাঈ এবং আদ দারাকুতনিতে। তবে, হাদিসটির উৎস নিয়ে এবং বর্ণিত সময়ের পার্থক্য নিয়ে দ্বিমত থাকায় এর গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে সংশয় রয়েই গেছে। এই বর্ণনার সঙ্গে সম্পৃক্ত ব্যক্তিরাও বিষয়টি নিয়ে ঝামেলায় পড়েছেন। হত্যার আর্থিক ক্ষতিপূরণের বিষয়ে নির্ভরযোগ্য বর্ণনা হলো, একটি জীবনের বিনিময়ে একশত উট দিতে হবে।

যেসব কর্তৃপক্ষ এ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, মহিলা কেউ খুন হলে তার বিনিময়ে পুরুষের তুলনায় অর্ধেক পরিমাণ রক্ত জরিমানা দিতে হবে, এ বিষয়ে আলেমদের ঐকমত্য পাওয়া যায় না। প্রখ্যাত সালাফ ইবনে উলাইয়া এবং আল আসাম নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্য সমান পরিমাণ রক্ত জরিমানা নির্ধারণের পক্ষে মত দিয়েছেন। তাদের এ অবস্থানের ভিত্তি হলো দুটি শব্দ, বিশ্বাসী এবং রূহ। কুরআনে এ দুটি শব্দ দিয়ে কোনো ধরনের লিঙ্গভেদ করা হয়নি। সবার ক্ষেত্রেই সাধারণভাবে এই দুটো শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে।

আমরাও যদি উপর্যুক্ত ব্যাখ্যার আলোকে এই মতামত ধারণ করি, আমাদেরকে

কোনোভাবেই দোষ দেয়া যাবে না। ফতোয়া পরিস্থিতি ও সময়ের আলোকে পরিবর্তিত হতে পারে। কিন্তু কেউ যদি এসে এখন নারীদের বেলায় রক্ত জরিমানার পরিমাণ অর্ধেক করতে চান, তা একদিকে যেমন বর্ণিত বয়ানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক হবে ঠিক তেমনি আবার ইসলামের মৌলিক শিক্ষার সঙ্গেও সঙ্গতিপূর্ণ হবে না।

রক্ত জরিমানা নারী ও পুরুষ সকলের জন্যই সমান। এ প্রসঙ্গে শায়খ শালতুত বলেন, মানুষ হিসেবে নারীদের শিকড় আর পুরুষদের শিকড় একই। তাদের রক্ত একইরকম। নারীরা যেমন পুরুষের রক্ত থেকে সৃষ্টি হয়েছে তেমনি পুরুষরাও এসেছে নারীদের রক্ত থেকেই। তাই পরকালে যেমন তাদের পাপের শাস্তি এক হবে, ঠিক তেমনি দুনিয়াতেও নারী ও পুরুষদের হত্যার বেলায়ও হত্যাকারী একই ধরনের শাস্তি পাবে। তাই কুরআনের এ সংক্রান্ত আয়াত উভয়ের বেলায় একইভাবে প্রযোজ্য হবে।

যেহেতু আমাদের আলোচনার প্রাথমিক উৎসই হলো কুরআন। তাই আমরা তাকেই প্রধানতম রেফারেন্স হিসেবে গণ্য করি। আর কুরআনে এ বিষয়ে পুরুষকে আলাদা কোনো সম্মান বা মর্যাদা দেয়া হয়নি। কুরআন বলছে :

وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَـًٔا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَّدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦٓ إِلَّآ أَن يَصَّدَّقُوا۟ ۚ

> যে ব্যক্তি ভুলক্রমে কোনো মুমিনকে হত্যা করে, সে একজন মুমিন ক্রীতদাস মুক্ত করবে এবং রক্ত বিনিময় সমর্পণ করবে তার স্বজনদেরকে। তবে যদি তারা সাদাকা (ক্ষমা) করে দেয়। সূরা আন নিসা ৪ : ৯২

এটা সত্য যে, রক্ত জরিমানার পরিমাণ নিয়ে স্কলারদের মধ্যে মতপার্থক্য ছিল। পুরুষদের হত্যার বেলায় নারীদের সমপরিমাণ অর্থ জরিমানা হিসেবে দেয়া হবে নাকি দ্বিগুণ পরিমাণ- তা নিয়েও চিন্তায় ভিন্নতা আছে। আল রাজি তার 'আত তাফসির আল কবির' গ্রন্থে পুরুষদের হত্যার ক্ষেত্রে রক্ত জরিমানার পরিমাণ দ্বিগুণ করার পক্ষে মত দিয়েছেন। তিনি অবশ্য একথাও উল্লেখ করেছেন যে, আল আসাম এবং ইবনে উলাইয়া একই পরিমাণ অর্থ দেয়ার পক্ষে অবস্থান নিয়েছেন। অনেকে এ প্রসঙ্গে উমার রদিয়াল্লাহু আনহু এবং ইবনে মাসউদ রদিয়াল্লাহু আনহু-এর মতামতকেও উল্লেখ করেছেন। কেউ কেউ আবার নিজেদের মতকে শক্তিশালী করার জন্য ইসলামের উত্তরাধিকার ও আইনী সাক্ষ্য বিষয়ক অবস্থানকে এর সঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন। কারণ, এ দুটি ক্ষেত্রে ইসলাম

বাহ্যত নারীকে পুরুষের তুলনায় অর্ধেক পরিমাণ দেয়ার নির্দেশ দিয়েছে।

আল আসাম সূরা নিসার ৯২ আয়াতের কথা উল্লেখ করে বলেছেন যে, নারী ও পুরুষ উভয়ের হত্যার ক্ষেত্রেই একই পরিমাণ অর্থ জরিমানা হিসেবে প্রদান করতে হবে।

২.৪ অভিভাবকত্ব

অভিভাবকত্বের মূল অংশটি আল্লাহ পুরুষদের ওপরই ন্যস্ত করেছেন। আল্লাহ বলেন :

اَلرِّجَالُ قَوّٰمُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّبِمَآ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ ط

পুরুষরা নারীদের উপর কর্তৃত্বশীল এজন্য যে, আল্লাহ একজনকে অন্যের ওপর বিশিষ্টতা দিয়েছেন এবং এজন্য যে, তারা তাদের অর্থ ব্যয় করে।

সূরা আন নিসা ৪ : ৩৪

অভিভাবকত্ব পুরুষদেরকে দেয়ার পেছনে দুটো কারণ রয়েছে। একজনকে কাজটি করতে হয় সহজাতভাবে আর অপরকে হয়ত যোগ্যতা অর্জন করে নিতে হয়। প্রথমত, আল্লাহ পুরুষদেরকে শারীরিকভাবে বেশি শক্তি প্রদান করেছেন। অন্যদিকে, মহিলাদেরকে শারীরিকভাবে তুলনামূলক দুর্বল করে বানিয়েছেন। তাদের শারীরিক গঠনও বেশ নমনীয়। দ্বিতীয়ত, আল্লাহ পুরুষকে পরিবার চালানোর দায়িত্ব দিয়েছেন। যদি কোনো পরিবার ধ্বংসের দিকে যায়, তাহলে তার দায়ও পুরুষকেই নিতে হবে। এ দুই বাস্তবতার কারণে গোটা দৃষ্টিভঙ্গিটাই ভিন্ন ভিন্ন হয়ে যায়।

২.৫ বিচারিক এবং রাজনৈতিক কার্যক্রম

ইমাম আবু হানিফা রহমাতুল্লাহি আলাইহি এ মর্মে মত দিয়েছেন যে, নারীদের এ ধরনের বিচারিক কার্যক্রম প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে কোনো বাধা নেই যেখানে সাক্ষ্য আইনটি তাদের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ এবং মামলাগুলোও অধিকাংশ ক্ষেত্রে ফৌজদারি বিধি সংক্রান্ত নয়। অন্যদিকে, আত তাবারি এবং ইবনে হাজম নারীদেরকে ফৌজদারি মামলা, অর্থ সংক্রান্ত মামলা এবং অন্যান্য মামলাতেও বিচারিক দায়িত্ব পালনের অধিকার দিয়েছেন। যদিও তারা নিষেধ করেননি বা আপত্তিও তোলেননি। তারপরও নারীদেরকে বাধ্য করে এসব দায়িত্বে বসানোর কোনো প্রয়োজন নেই। বরং বিভিন্ন পরিস্থিতি ও সময়ের চাহিদার আলোকে তাদেরকে এ দায়িত্ব দেয়া যেতে পারে। তবে, জনস্বার্থ এবং সর্বোপরি ইসলামের

অবস্থানকে এক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দিতে হবে। এরকমভাবে এমন হতেই পারে যে, অনেক নারী তাদের জীবনের একটি পর্যায়ে এসে বিশেষ পরিস্থিতিতে এবং বিশেষ কিছু মামলায় বিচারক হিসেবে দায়িত্ব পালনের সুযোগ পেয়ে যেতে পারেন।

অন্যদিকে, নারীদেরকে যদি রাষ্ট্র পরিচালনা বা খেলাফতের দায়িত্ব পালনের কথা বলা হয়, তাহলে তা তাদের সাধ্যের তুলনায় অনেক বড় জিম্মাদারি হয়ে যাবে, যা আনজাম দিয়ে যাওয়া তাদের জন্য খুব সহজ নয়। সেই সঙ্গে, এ ধরনের গুরুদায়িত্ব তাদের মাতৃত্বের জিম্মাদারির সঙ্গে সাংঘর্ষিকও হতে পারে। তারপরও এ ধরনের দায়িত্বে মেয়েদের আসার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেয়া যায় না। কেননা, আমরা সবাই জানি, কোনো কোনো ক্ষেত্রে নারীরা পুরুষদের তুলনায় অধিক যোগ্য ও সক্ষম হয়। উদাহরণ হিসেবে সাবার রাণীর কথা বলা যায়, যার কথা আল কুরআনে উল্লেখ আছে। তিনি তার জাতিকে সুন্দরভাবে পরিচালনা করেছিলেন। তার নেতৃত্বে জনগণও অনেক শান্তিতে ও স্বস্তিতে ছিল। অন্যদিকে, তিনি নবী সুলাইমান আলাইহিস সালাম-এর সময়ে বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণও করেছিলেন।

তারপরও কথা থাকে। ব্যতিক্রম কখনো নিয়ম হয় না। বরং যা অহরহ ঘটে থাকে, তাই নিয়ম হিসেবে দাঁড়িয়ে যায়। স্কলারগণও এইমতের সঙ্গে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। একজন নারী ম্যানেজার, ডিন, পরিচালক, সংসদ সদস্য, মন্ত্রী সবই হতে পারবেন যদি তিনি সেই দায়িত্বের হক আদায় করতে পারেন। আমি এই সকল বিষয় নিয়ে আরো বিশদভাবে আমার আরেকটি বই 'সমসাময়িক আইনী মতামত' ও 'ফতওয়ায়ে মুআসিরাহ'-তে আলোচনা করেছি।

৩

নারীর নারীত্ব

৩.১ একজন নারী তার নারীত্বেই সুন্দর

ইসলাম সবসময়ই একজন নারীর নারীত্বকে প্রশংসা করেছে, মূল্যায়ন করেছে। নারীর কার্যক্রমকে পুরুষের মতোই গুরুত্বপূর্ণ ও সমাজের জন্য অবিচ্ছেদ্য বলে মনে করেছে। পুরুষের জন্য নারীর ভূমিকাকে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বলে স্বীকৃতি দিয়েছে আবার নারীর জন্যেও পুরুষের ভূমিকাকে অনস্বীকার্য হিসেবে মূল্যায়ন করেছে। নারী ও পুরুষকে কখনোই একে অপরের শত্রু, প্রতিপক্ষ বা প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবার সুযোগ নেই। বরং প্রত্যেকেই যেন তার ওপর আরোপিত দায়িত্বগুলো যথাযথভাবে পালন করতে পারে সেই ব্যাপারে সহযোগিতা করা দরকার, কেননা এভাবেই গোটা মানবজাতির কল্যাণ সাধন হয়।

আল্লাহ বিশ্বজগতকে এমনভাবে বিনির্মাণ করেছেন যা মানুষের এই যুগল লিঙ্গের অস্তিত্বকে সহজাত হিসেবেই লালন করে। এই নীতি ও দৃষ্টিভঙ্গি শুধু মানুষ নয়, অন্যান্য প্রাণীর মধ্যেও বিদ্যমান। উদ্ভিদ ও প্রাণীকূলেও নারী ও পুরুষের দুই ধরনের বৈশিষ্ট্যই অত্যন্ত কার্যকরভাবে উপস্থিত। অন্যদিকে, প্রাণহীন জগতেও পজিটিভ ও নেগেটিভ বৈশিষ্ট্যের দুটো নিদর্শন পাওয়া যায়। চুম্বকত্ব, তড়িৎশক্তি এবং অন্যান্য ক্রিয়া প্রতিক্রিয়াতেও একই সূত্র লক্ষ্য করা যায়। এমনকি এটমের অভ্যন্তরেও পজিটিভ ও নেগেটিভ নামে দুটো বিপরীতধর্মী চার্জের অস্তিত্ব পাওয়া যায়; যার একটি হলো প্রোটন আর অপরটি ইলেকট্রন। প্রায় ১৫শ বছর আগে মহাপবিত্র আল কুরআন এ বিষয়টিকে সুনিশ্চিত করেছে। পবিত্র কুরআনুল কারিম বলছে :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۝

> আমি প্রত্যেক বস্তু জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছি, যাতে তোমরা অনুধাবন করো।
> সূরা আয যারিয়াত ৫১ : ৪৯

নারী ও পুরুষ হলো একই বৃন্তের দুটো ফুল। এ দুই প্রজাতির সমন্বয়ের মধ্য দিয়েই একটি বিষয়ের সৃষ্টি হয়। এ দুই সৃষ্টির একটি অপরটি ছাড়া অস্তিত্বহীন। যখন আল্লাহ প্রথম মানুষ হিসেবে আদম আলাইহিস সালামকে সৃষ্টি করলেন, সেই আদম থেকেই তিনি তার সঙ্গী হাওয়া আলাইহিস সালামকেও সৃষ্টি করেছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল, যাতে তারা দুজন একইসঙ্গে শান্তিতে ও স্বস্তিতে

বসবাস করতে পারে। আল্লাহ ইচ্ছে করলে আদম আলাইহিস সালামকে জান্নাতে একা রাখতে পারতেন। সেই ধরনের যাবতীয় ব্যবস্থাও সেখানে ছিল। কিন্তু আল্লাহ রব্বুল আলামীন সেই কৌশল অবলম্বন করেননি। আল্লাহ তাদের দুজনকেই একই আদেশ করেছিলেন এবং একইসঙ্গে তাদের উভয়ের জন্য একটি গাছকে নিষিদ্ধ করেছিলেন। আল্লাহ বলেন :

وَقُلْنَا يَٰٓـَٔادَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّٰلِمِينَ ○

আমি আদমকে হুকুম করলাম যে, তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস করতে থাক এবং ওখানে যা চাও, যেখান থেকে চাও, পরিতৃপ্তিসহ খেতে থাক, কিন্তু এ গাছের নিকটবর্তী হয়ো না। অন্যথায় তোমরা যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়বে।

সূরা আল বাকারা ২ : ৩৫

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে এটা পরিষ্কার যে, নারী ও পুরুষ গাঠনিক ও স্বভাবজাতভাবেই আলাদা। নারীরা পুরুষের জন্য সহায়ক আর পুরুষরা নারীর জন্য। প্রত্যেকে একে অপরের সম্পুরক। কুরআন পরিষ্কারভাবেই নারী ও পুরুষের মধ্যে পার্থক্য নিরুপণ করেছে। আল্লাহ বলেন :

وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ

ছেলেরা কখনোই মেয়েদের মতো নয়। সূরা আলে ইমরান ৩ : ৩৬

মূলত এ দুই লিঙ্গের মানুষ পজিটিভ ও নেগেটিভ বৈশিষ্ট্যের মতই পার্থক্য নিয়ে বিরাজমান। তবে, এই পার্থক্য মানেই বৈপরীত্য বা শত্রুতা নয়। এই ভিন্নতা থেকেই তাদের সৃষ্টি আর এই ভিন্নতার জন্যই তারা একে অপরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। আল্লাহ বলেন :

بَعْضُكُم مِّنۢ بَعْضٍ

তোমরা পরস্পর এক। সূরা আন নিসা ৪ : ২৫

আল্লাহ আরও বলেন :

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَٰتِ ط

আল্লাহ তোমাদের জন্যে তোমাদেরই শ্রেণী থেকে জোড়া সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের দুজন থেকে তোমাদেরকে পুত্র ও কন্যা দিয়েছেন এবং তোমাদেরকে উত্তম জীবনোপকরণ দান করেছেন। সূরা আন নাহল ১৬ : ৭২

আল্লাহ্ তাঁর প্রজ্ঞায় নারীদেরকে শারীরিক ও মানসিকভাবে এমনভাবে সৃষ্টি করেছেন যাতে তারা পুরুষকে আকৃষ্ট করতে পারে এবং নিজেরাও পুরুষদের প্রতি আকৃষ্ট হয়। এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে আল্লাহ্ পুরুষ ও নারীকে এমন কিছু সহজাত আবেগ, প্রবৃত্তি এবং অনুভূতি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন যার ফলে তারা উভয়েই উভয়ের প্রতি তীব্র আকর্ষণ বোধ করেন, একসঙ্গে মিলেমিশে থাকেন, সম্পর্ক তৈরি করে জীবনকে এগিয়ে নিতে পারেন। আর এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই পরবর্তী প্রজন্ম আসে এবং পৃথিবী এগিয়ে যায়।

এ কারণে, প্রকৃতিগত ও সহজাত এই পদ্ধতিগুলোর সঙ্গে সাংঘর্ষিক- এমন কোনো প্রথা ও বিধানকে ইসলাম অনুমোদন করে না। একই কারণে বৈরাগ্যবাদ বা সন্ন্যাসবাদের মতো বিষয়গুলোকেও ইসলাম অনুমোদন করে না। কারণ, এগুলোর মধ্য দিয়ে মানবিক শক্তি ও সক্ষমতাকে ভিন্ন কোনো দিকে প্রবাহিত করা হয়। আল্লাহ্ বিবাহের যে নিয়ম বলে দিয়েছেন প্রকৃতপক্ষে তা হলো একটি পরিবারের মূল ভিত্তি। এ কারণে ইসলাম সব ধরনের পরকীয়া, বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক এবং দৃশ্য-অদৃশ্য কামুকতাকে প্রত্যাখান করেছে। যে ধরনের অবকাশ একজন মানুষকে এ জাতীয় অনিষ্টকর কাজের দিকে নিয়ে যায়, ইসলাম সেগুলোকে বন্ধ করে দিয়েছে। এভাবেই ইসলাম নারী ও পুরুষকে সব ধরনের লাঞ্ছনা ও পশুবৃত্তি থেকে হেফাজত করেছে।

নারীত্বের সহজাত বিষয়গুলোকে প্রণোদনা দেয়ার জন্য এবং পুরুষের সঙ্গে সম্পর্ক করার ক্ষেত্রে নারীদের জন্য অনুকূল পরিবেশ ও সুযোগ সৃষ্টি করার উদ্দেশে ইসলাম নারীদের জন্য বেশ কিছু বিধি-বিধান ও নির্দেশনা প্রণয়ন করেছে। ইসলাম এমন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে যাতে নারীরা তার নারীত্বকে হেফাজত করতে পারে। নিজের প্রয়োজনগুলো চেপে না রেখে বরং পূরণ করতে পারে। নারীরা কোনোভাবেই যেন অসম্মানের শিকার না হয়, ইসলাম তা নিশ্চিত করেছে। মানুষরূপী হায়েনারা যেন নারীদের ওপর চড়াও না হয়, তারা যেন নারীদের ওপর নিজেদের অযাচিত কামনা-বাসনাকে চরিতার্থ না করতে পারে, ইসলাম সেই বিষয়ে শক্ত অবস্থান গ্রহণ করেছে।

নারীত্বের বিষয়ে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গিকে সংক্ষেপে নিম্নোক্তভাবে তুলে ধরা যায়।

ক. ইসলাম নারীত্বকে এমনভাবে হেফাজত করতে চায় যাতে নারীর সম্ভ্রম, ইজ্জত, কমনীয়তা, সৌন্দর্য ও স্থিরতা অক্ষুণ্ন থাকে। এ কারণে পুরুষদের

জন্য নিষিদ্ধ এমন বেশ কিছু বিষয়কে নারীদের জন্য অনুমোদন করা হয়েছে। যেমন নারীরা স্বর্ণ ও রেশমি কাপড় পরিধান করতে পারবেন।

আলী ইবনে আবু তালিব রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার বাম হাতে কিছু রেশমী বস্ত্র এবং ডান হাতে কিছু স্বর্ণ নিলেন এবং সেগুলোসহ তাঁর দুহাত উপরে তুলে বলেন, আমার উম্মতের পুরুষদের জন্য এ দুটির ব্যবহার হারাম এবং তাদের মহিলাদের জন্য হালাল। ইবনে মাজাহ ৩৫৯৫

এ বিষয়গুলো নারীদের সঙ্গে মানানসই বলে এগুলো ব্যবহার করার যেমন সুযোগ দেয়া হয়েছে, অন্যদিকে যে বস্তুগুলো নারীত্বের সঙ্গে মানায় না, সেগুলোকে নারীদের জন্য নিষিদ্ধও করা হয়েছে। যেমন, পুরুষদের পোশাক এবং পুরুষদের মতো আচার আচরণ ও চলাফেরা।

আবু হুরাইরা রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওইসব পুরুষকে অভিশাপ দিয়েছেন যারা নারীর অনুরূপ পোশাক পরে এবং ওইসব নারীকে যে পুরুষের মতো পোশাক পরিধান করে। আবু দাউদ ৪০৯৮

পুরুষরা নারীর মতো আচরণ করবে এটা যেমন আল্লাহ্ অপছন্দ করেন ঠিক তেমনি নারী পুরুষদের মতো আচরণ করবে, এটাও আল্লাহ পছন্দ করেন না।

আবদুল্লাহ ইবনে উমার রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহ ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তিন ধরনের লোক জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। শেষ বিচারের দিন আল্লাহ তাদের দিকে রহমতের দৃষ্টিতেও তাকাবেন না। একটি হলো সেই সন্তান যে তার পিতামাতার প্রতি অবাধ্য, দ্বিতীয়ত, পুরুষের ন্যায় আচরণকারী মহিলা এবং তৃতীয়ত, যারা ব্যভিচারী। আন নাসাই ৫ : ৮, আল হাকিম ১ : ৭২

খ. ইসলাম নারীত্বকে সমর্থন করে এর প্রাসঙ্গিক দুর্বলতাকে সঙ্গে নিয়ে। এ কারণে কিছু সহযোগিতার দায় ইসলাম পুরুষের ওপরও দেয়। বিশেষ করে, জীবনযাত্রার ব্যয় এবং প্রয়োজন পূরণের অনেকটা দায় পুরুষকেই দেয়া হয়েছে। নারীরা অবিবাহিত অবস্থায় পিতার, বিবাহিত অবস্থায় তার স্বামীর এবং তার সন্তান বা ভাইয়ের জিম্মায় থাকবে। এ মানুষগুলো শরীয়া কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় প্রয়োজন পূরণে সহায়তা করবে। কোনো মৌলিক প্রয়োজন পূরণ করতে গিয়ে একজন নারীকে যেন ভুল পথে

আগাতে বা অযাচিত কোনো সংঘাতে জড়াতে না হয়। আজ যেমন পুরুষদের সঙ্গে অযাচিত প্রতিযোগিতায় জড়িয়ে পশ্চিমা দেশগুলোতে নারীরা এমন অবস্থায় যেতে চায় যাতে তাদেরকে আর পিতা, স্বামী, ভাই বা সন্তানের ওপর নির্ভরশীল না থাকতে হয়। আর এ যুক্তি দিয়েই টাকা উপার্জনের জন্য তারা যেকোনো ধরনের কাজে যুক্ত হয়ে যায়।

গ. আল্লাহ প্রদত্ত জীবন বিধান একজন নারীর ভাবমর্যাদা ও মার্জিত অবস্থানকে সুরক্ষা প্রদান করে। তার সুনাম ও ইজ্জতকে হেফাজত করে। সব ধরনের আশপাশের মানুষের বাজে খায়েশ ও কুরুচিপূর্ণ মানসিকতা থেকেও তাকে হেফাজত করে। এই মহৎ উদ্দেশ্যগুলোকে বাস্তবায়ন করার অংশ হিসেবে ইসলাম নারীর ওপর কিছু দায়িত্ব অর্পণ করে। যেমন :

১. চোখের দৃষ্টি সংযত রাখা। নিজের ইজ্জত ও আব্রুকে হেফাজত করা। আল্লাহ বলেন :

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ

মুমিন পুরুষদেরকে বলুন তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গের হেফাযত করে। সূরা আন নুর ২৪ : ৩০

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ

আর মুমিন নারীদেরকে বলুন, যেন তারা তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাযত করে। সূরা আন নুর ২৪ : ৩১

২. মার্জিত আচরণ বজায় রাখা। পোশাক ও অলংকার ব্যবহারের ক্ষেত্রে সংযত থাকা। নিজেকে কোনো অবস্থাতেই উগ্রভাবে উপস্থাপন করা যাবে না। আল্লাহ বলেন :

وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ ص

তারা যেন যা সাধারণত প্রকাশমান, তাছাড়া তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে এবং তারা যেন তাদের মাথার ওড়না বক্ষ দেশে ফেলে রাখে। সূরা আন নুর ২৪ : ৩১

বিশেষ করে, হাতে আংটি, মুখ খোলা, দুটি হাত ও দুটি পা মুক্ত রাখার বিষয়েও

নারীদেরকে সতর্ক করতে হবে।

৩. অন্যান্য যেসব বিষয়াবলী থেকে আকর্ষণ সৃষ্টি হতে পারে অর্থাৎ তার চুল, গলা, ঠোঁট, বাহু এবং পা যেন তার স্বামী এবং অন্যান্য মাহরাম ব্যতীত আর কারো সামনে প্রকাশ না করে। অর্থাৎ এমন মানুষদের সামনেই এগুলো প্রকাশ করা যাবে যাদেরকে বিয়ে করা বৈধ নয়। আল্লাহ বলেন :

وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اٰبَآئِهِنَّ اَوْ اٰبَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اَبْنَآئِهِنَّ اَوْ اَبْنَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْٓ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْٓ اَخَوٰتِهِنَّ اَوْ نِسَآئِهِنَّ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ اَوِ التّٰبِعِيْنَ غَيْرِ اُولِي الْاِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ اَوِ الطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوْا عَلٰى عَوْرٰتِ النِّسَآءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِاَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ ۚ

তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুস্পুত্র, ভগ্নিপুত্র, অধিকারভুক্ত দাসী, যৌন কামনামুক্ত পুরুষ ও বালক এবং যারা নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ, তাদের ব্যতীত কারো আছে তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে। তারা যেন তাদের গোপন সাজ-সজ্জা প্রকাশ করার জন্য জোরে পদচারণা না করে। সূরা আন নূর ২৪ : ৩১

আল্লাহ আরও বলেন :

اِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِيْ فِيْ قَلْبِهٖ مَرَضٌ وَّ قُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا

তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, আর গায়ের মাহরাম পুরুষের সঙ্গে কোমল ও আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে কথা বলবে না। কেননা, যার অন্তরে ব্যাধি রয়েছে সে প্রলুব্ধ হবে। আর কথা বলবে ন্যায়সঙ্গতভাবে। সূরা আল আহযাব ৩৩ : ৩২

এ বিষয়টি ভালোভাবে বুঝতে হবে। নারীদেরকে কথা বলতে না করা হয়নি। এমনও নয় যে, নারীর কণ্ঠস্বরকে এতটাই বাজে বলা হয়েছে যা অপরকে শুনানো যায় না। বরং নারীকে সঠিক ঈমান ও খুলুসিয়াতের সঙ্গে কথা বলার পরামর্শ দেয়া হয়েছে।

জাহেলী যুগে নারীদের আচার-আচরণ ও কথা-বার্তা এমন ছিল যাতে পুরুষরা আকৃষ্ট হয়। আধুনিক যুগেও যারা জাহেলী মানসিকতা লালন করেন তারা এ

ধরনের আচরণ করেন। এমন ব্যবহার ও মানসিকতা কখনোই মার্জিত নারীদের বৈশিষ্ট হতে পারে না।

যে পুরুষগণ স্বামী বা বৈধ সম্পর্কের বাইরে তাদের থেকে নিজেকে সংযত করে সরিয়ে রাখতে হবে। পরপুরুষের সঙ্গে এমনভাবে মেলামেশা করা যাবে না, যাতে তাদের কারো মধ্যে কোনো ধরনের পাপবোধ জাগ্রত হয়। রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কোনো পুরুষ নারীদের সঙ্গে একান্তে মিশবে না। আবার নারীও মাহরাম ছাড়া অন্য কারো সঙ্গে সফরে যাবেন না।

প্রয়োজন ছাড়া কোনো ধরনের জনসমাগমে যাবেন না। গেলেও নির্দিষ্ট ও অনুমোদিত সীমার মধ্যেই থাকার চেষ্টা করবেন। যদি মসজিদে জামাতে অংশ নিতে চায় এবং কোনো বিষয়ে শিক্ষা অর্জন করতে চায় তাহলে তাকে অনুমোদিত পুরুষের সান্নিধ্যে থেকেই যেতে হবে।

নারীরা যদি তার আশপাশের মানুষকে সাহায্য করতে চায়, তাহলে তাকে সুযোগ দিতে হবে। এক্ষেত্রে কোনো ধরনের বাধা বা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা যাবে না। বরং এমন একটি অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে- যাতে এ কাজটি করতে নারীর কোনো অসুবিধা না হয়। মনে রাখতে হবে, ইসলামে সামাজিক বিধানের যে শর্তাদি আছে, তা সকলক্ষেত্রেই মান্য করতে হবে।

এসব নির্দেশনা এবং নিয়মবিধির মধ্য দিয়ে ইসলাম নারী ও নারীত্বকে হেফাজত করার চেষ্টা করে। অযাচিত কথাবার্তা থেকে নারীকে সুরক্ষা প্রদান করে। নারীর মর্যাদা ও সম্ভ্রমকে হেফাজত করে। সব ধরনের বিচ্যুতি থেকে তাকে দূরে সরিয়ে রাখে। ইসলাম সব ধরনের গীবত, পরচর্চা, পরনিন্দা এবং অপবাদের হাত থেকে নারীকে মুক্ত রাখার সুপারিশ করে।

সর্বোপরি, ইসলাম নারীর রূহকে হেফাজত করে। বিভিন্ন ধরনের উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা থেকে নারীকে সুরক্ষা করে। অস্থিতিশীলতা এবং কুরুচিপূর্ণ খায়েশ থেকে তাকে হেফাজত করে। নারীর অন্তর থেকে উত্তেজনা এবং প্রবৃত্তির কামনাকে প্রশমন করে। একইসঙ্গে ইসলাম পুরুষদেরকেও অযাচিত আবেগ, উত্তেজনা থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করে। এভাবে নারী ও পুরুষ উভয়কে নিরাপত্তা দেয়ার মধ্য দিয়ে ইসলাম সমাজ ও পরিবারের ভাঙনকে সার্থকভাবে প্রতিহত করে।

৩.২ নারী ও পুরুষের বৈধ মেলামেশার স্বরূপ

কিছু কিছু শব্দ আছে যা নতুন নয়। বহু আগে থেকেই আমাদের ভাষায় আছে। কিন্তু হঠাৎ করে সাম্প্রতিক সময়ে এসে যেন ভিন্ন ধরনের তাৎপর্য লাভ

করেছে। এরকমই একটি শব্দ হলো মিক্সিং বা মেলামেশা। মূলত এর মাধ্যমে কোনো একটি স্থানে নারী ও পুরুষের মেলামেশাকে বুঝানো হয়।

রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সময়ে, পরবর্তীতে সাহাবীদের সময়ে, কিংবা তারও পরবর্তীতে তাবেয়ী বা তাবে-তাবেয়ীদের সময়ে মুসলিম নারী ও পুরুষ বিভিন্ন সামাজিক ও ধর্মীয় আয়োজনে যেত এবং পারস্পরিক দেখা সাক্ষাতও হতো। ইসলামে এ বিষয়টিকে নিষিদ্ধও করা হয়নি। তবে, এ ধরনের ঘটনার বেলায় সবসময়ই সঠিক পরিস্থিতি এবং সঠিক কারণটিকে বিবেচনায় নিতে বলা হয়েছে। নারী ও পুরুষ বৈধ ও যুক্তিসঙ্গত কারণে দেখা করতেই পারে। কিন্তু সেই দেখাকে কখনোই ইতোপূর্বে মিক্সিং বা মেলামেশা হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়নি।

আমাদের এ সময়ে এসে এই মিক্সিং বা মেলামেশা শব্দটি বহুল ব্যবহৃত হয়ে পড়েছে। আমি ঠিক বলতে পারব না যে, কখন থেকে বর্তমান দৃষ্টিভঙ্গির এ বিষয়টিকে মূল্যায়ন করা শুরু হলো। মেলামেশা একটি বিষয়, কিন্তু অনেকেই এখানে মেলামেশা বলতে একাকার হয়ে যাওয়াকেও বুঝিয়ে থাকেন। পানিতে চিনি ও লবণ যেভাবে মিশে পানির সঙ্গে একাকার হয়ে যায়, অনেকে নারী ও পুরুষের মেলামেশাকে সেভাবেও ব্যাখ্যা করেন, যা মোটেই স্বস্তিদায়ক নয়।

সে যাহোক, বিষয়টির অবতারণা করলাম এ কারণে যে, সামাজিক মেলামেশা বা যোগাযোগ সর্বক্ষেত্রে নিষিদ্ধ, তা নয়। অনেকে যেভাবে সকল ক্ষেত্রেই একে বৈধতা দিতে চান তা যেমন গ্রহণযোগ্য নয়, আবার যেভাবে কিছু কট্টরপন্থী বিষয়টিকে সরাসরি প্রত্যাখান করে, তাও বাস্তবসম্মত নয়। তাছাড়া, সকল ধরণের মেলামেশাকেও বৈধতা দেয়া হয়নি, যদিও পশ্চিমারা এভাবেই বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করে।

আমি আমার প্রসিদ্ধ বই 'সমসাময়িক আইনী মতামত' (ফতওয়া মুআসিরাহ)-তে এ বিষয়ে এবং একই ধরনের আরো কিছু বিষয়ে উত্তর দেয়ার চেষ্টা করেছি। বিশেষত নারীদেরকে শুভেচ্ছা জানানো, তাদের সঙ্গে মোসাফাহ করা, পুরুষ ডাক্তারদের কাছে নারী রোগীদের চিকিৎসা বা পুরুষ রোগীদেরকে নারী চিকিৎসকদের দিয়ে চিকিৎসাসহ আরও বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেছি। কোনো সচেতন নারী ও পুরুষ যদি এসব বিষয়ে ইসলামের নির্দেশনা জানতে চান তবে তারা সেই আলোচনা থেকে উপকৃত হতে পারবেন।

এরপরও এ পরিসরে আমি এটা বলতে চাই যে, আমাদের উচিত সবসময় রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তার সাহাবী এবং সৎকর্মপরায়ণ বান্দাদের পথ অনুসরণ করা। তারা যেসব নির্দেশনা দিয়েছেন তার সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকা, পশ্চিমারা

আমাদেরকে যে বুঝগুলো দেয় তা পরিহার করা এবং একই সঙ্গে প্রাচ্যের বৈরাগ্যবাদকেও প্রত্যাখান করা।

রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নির্দেশনাগুলোকে পর্যালোচনা করলে আমরা বুঝতে পারি যে, নারীদেরকে নিছক বিচ্ছিন্ন করে রাখার জন্য সৃষ্টি করা হয়নি। খাঁচায় বন্দি হয়ে থাকাও তাদের প্রাপ্য নয়। যদিও ইসলামের পরবর্তী সময়ে মুসলিমরা সত্যিকারের ইসলামিক চেতনা থেকে দূরে সরে আসার কারণে অনেক নারীকেই এ জাতীয় ভোগান্তির শিকার হতে হয়েছিল। রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সময়ে মুসলিম নারীরা শুক্রবারের জুমআর সলাতে সমবেত হতেন। অনেক সময় তারা ফজর ও ইশার জামায়াতেও শরীক হতেন। রসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে পুরুষদের পেছনে কাতারবন্দী হয়ে সলাত পড়ার অনুমতি দিয়েছিলেন। অনেকক্ষেত্রে, তখনকার সময়ে নারীদেরকে একটু অগোচরে সলাত আদায় করতে বলা হতো, যাতে পুরুষদের স্পর্শকাতর অঙ্গগুলো তাদের চোখে না পড়ে। কারণ, সেই সময় অবধি পুরুষদের আন্ডারওয়্যার বা ট্রাউজার পড়ার চর্চা পুরোদমে চালু হয়নি।

ইসলামের একেবারে শুরুর দিকে নারী ও পুরুষ একই দরজা দিয়ে মসজিদে প্রবেশ করত। তাই সেখানে জটলাও সৃষ্টি হতো। পরে অবশ্য উভয়ের প্রবেশের জন্য পৃথক দরজা চালু করা হয়।

> ইবনে উমার রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমরা যদি এ দরজাটি কেবল নারীদের (মসজিদে যাতায়াতের) জন্য ছেড়ে দিতাম! নাফি' রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, (এরপর থেকে) ইবনু উমার রদিয়াল্লাহু আনহু মৃত্যু পর্যন্ত ঐ দরজা দিয়ে আর (মসজিদে) প্রবেশ করেননি। আবু দাউদ ৪৬২

রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সময় থেকেই নারীরা জুমআ বারের জামাতের জন্য সমবেত হতেন। তারা খুতবা শুনতেন। তারা মসজিদে এতটা সামনে এগিয়ে বসতেন যাতে তারা পরিস্কারভাবে রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর খুতবা ও তেলাওয়াত শুনতে পারেন। নারীরা তখন থেকেই ঈদের জামাতে শরীক হতেন এবং এ ধরনের সব ধর্মীয় আয়োজনেই অংশ নিতেন। নারী-পুরুষ, বৃদ্ধ-যুবক, শিশু, কিশোর-কিশোরী সব বয়সের মানুষই ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদিতে অংশ নিয়ে আল্লাহর স্মরণ করতেন।

উম্মু আতিয়্যাহ রদিয়াল্লাহু আনহা ওই সময়ের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সময়ে আমরা নিয়মিতভাবে ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলোতে যেতাম।

উম্মু আতিয়্যাহ রদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদেরকে নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আদেশ করেছেন, আমরা যেন পরিণত বয়স্কা মেয়েদেরকে ও পর্দানশীন মেয়েদেরকে ঈদের সলাতে যেতে বলি এবং তিনি ঋতুবতী নারীদেরকে আদেশ করেছেন তারা যেন মুসলিমদের সলাতের স্থান থেকে কিছুটা পৃথক থাকে। মুসলিম ১৯২৪

অর্থাৎ যাদের পিরিয়ড চলবে, তারা সলাত আদায় না করে একটু দূরে অবস্থান করবে এবং সেখান থেকেই তারা অন্যান্য মুসলিমদের ইবাদত ও আমলগুলো পর্যবেক্ষণ বা উপভোগ করবেন।

উম্মু আতিয়্যাহ্ রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদেরকে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আদেশ করেছেন। আমরা যেন পরিণত বয়স্কা, ঋতুবতী ও গৃহবাসিনী মহিলাদেরকে ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহাতে বের করে দেই। তবে ঋতুবতী মহিলারা সলাত থেকে বিরত থাকবে। বাকী পুণ্যের কাজে ও মুসলিমদের দুআয় শরীক হবে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমাদের কারো কারো চাদর ওড়না নেই। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তার জন্য তার বোন তাকে নিজ চাদর বা ওড়না পরিয়ে দিবে। মুসলিম ১৯২৬

মুসলিম জীবনের এই দিকটি অনেক মুসলিম দেশই অগ্রাহ্য করে যাচ্ছে। তবে এটাও বাস্তব যে, বেশ কিছু যুবক আধুনিক চিন্তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে চলতে চাইছেন এমন কিছু মানুষের প্রচেষ্টার কারণে। রমাদানের শেষ দশ দিনের ইবাদতে এবং ঈদের নামাজে মহিলাদের অংশগ্রহণ এখন আগের তুলনায় বেড়েছে।

রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীদেরকে কিছু শেখাতেন বা আলোচনা করতেন, সেসব আয়োজনে নারীরা সবসময়ই অংশ নিয়েছেন। এর বাইরে, নারী বিষয়ক যদি কোনো প্রশ্ন কারও মনে থাকত, তাহলে তারা উম্মুল মুমিনিন আয়েশা রদিয়াল্লাহু আনহার কাছে প্রশ্নগুলো রাখতেন। আয়েশা রদিয়াল্লাহু আনহু নিজেও মহিলাদের প্রশ্ন করার বা জানতে চাওয়ার এ বিষয়টিকে খুবই প্রশংসা করতেন। তিনি খুশি হতেন যখন দেখতেন যে, মহিলারা তাদের লজ্জা ও মানসিক সংকীর্ণতা থেকে বের হয়ে এসে ধর্মের বিষয়ে প্রশ্ন করছে। এমনকি যৌনতা কিংবা বীর্যপাত বা মাসিকের সময় রক্তপাত বন্ধ না হলে কিভাবে ইবাদত করবে, সহবাসের পর কিভাবে শরীরকে পাক-পবিত্র করবে এসব বিষয়েও জানতে চাইছে।

তবে, এত কিছু করেও নারীরা সন্তুষ্ট ছিল না। পুরুষরা যেভাবে রসূল সল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছ থেকে অনেক কিছু সরাসরি জানার সুযোগ পেত, মহিলারা তা পেত না। তাই তারা রসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে নিজেদের জন্য বিশেষ একটি দিন বরাদ্দ করার অনুরোধও করেছিলেন, যেদিন অন্য পুরুষদের ভীড় কম থাকবে।

> আবু সাঈদ খুদরী রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। নারীরা একদিন নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললেন, পুরুষরা আপনার কাছে আমাদের চেয়ে প্রাধান্য বিস্তার করে আছে। তাই আপনি নিজে আমাদের জন্য একটি দিন নির্ধারিত করে দিন। তিনি তাদের বিশেষ একটি দিনের অঙ্গীকার করলেন; সেদিন তিনি তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন, তাদের নসীহত করলেন এবং নির্দেশ দিলেন।
>
> মুসলিম ৪৫ : ২৬৩৩, আহমাদ ১১২৯, বুখারি ১০২। (ইসলামিক ফাউন্ডেশন)

এমনকি ইসলামের ইতিহাসে যে সব যুদ্ধ হয়েছিল সেগুলোতেও নারীদের অংশ গ্রহণের কথা জানা যায় যেখানে তারা তাদের শারীরিক গঠনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছিলেন। তারা এসব যুদ্ধে আহতদের চিকিৎসা করতেন, তাদেরকে সেবা প্রদান করতেন, আহত সেনাদেরকে পথ্য সেবন করাতেন। পাশাপাশি, রান্না, পানিবহন করাসহ নানা কাজও করেছিলেন।

> উম্মু আতিয়্যাহ রদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সঙ্গে সাতটি সামরিক অভিযানে অংশ নিয়েছি। এসব অভিযানে আমি সেনাদের যুদ্ধের অস্ত্র ও সরঞ্জাম পাহারা দিতাম, তাদের খাবার রান্না করতাম, আহতদের চিকিৎসায় সহযোগিতা করতাম এবং অসুস্থদের সেবা করতাম। মুসলিম ১৮১২
>
> আনাস রদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, উহুদের যুদ্ধের সময় আমি দেখলাম, মা আয়েশা তার জামার হাতা গুটিয়ে নিলেন, পানির ব্যাগ নিয়ে কুপের কাছে গেলেন, সেই কুপ থেকে ব্যাগে পানি ভরে নিজের পিঠে তা বহন করে এনে অন্যান্য সাহাবীদের মুখে ঢেলে দিচ্ছেন। মুসলিম ১৮১১

এ হাদিসের ব্যাখ্যায় জানা যায়, আয়েশা রদিয়াল্লাহু আনহার বয়স তখনও বেশ কম ছিল। বয়স্ক মহিলাদের যুদ্ধে যাওয়ার সুযোগ আছে এটাও যে সত্য নয় তাও এ হাদিস থেকে জানা যায়। বাস্তবের আলোকে বলতে গেলে এটাই সত্য হিসেবে প্রতীয়মান হয় যে, যুদ্ধের যে পরিশ্রম ও হাড়ভাঙা খাটুনি, তা অনেক ক্ষেত্রেই বয়স্ক মহিলাদের পক্ষে করাটা কঠিন।

এ প্রসঙ্গে ইমাম আহমাদ রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর একটি বর্ণনায় জানা যায়, ছয়জন মুমিন নারী খায়বারের অবরোধের সময় উপস্থিত ছিলেন। তাদের কাজ ছিল মুসলিম সেনাদের ধনুকে তীর সংযুক্ত করা, রান্না করা, পানি গরম করা এবং

আহতদের সেবা করা। যুদ্ধ শেষে রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেই নারীদেরকে গনীমাতের মাল থেকে তাদের প্রাপ্য অংশ প্রদান করেন। এই ঘটনা নিম্নোক্ত হাদিস থেকে জানা যায়।

> হাশরাজ ইবনু যিয়াদ রহমাতুল্লাহি আলাইহি তার পিতার মা অর্থাৎ তার দাদীর সূত্র থেকে বর্ণনা করেন। তিনি (দাদী) পাঁচজন মহিলাসহ রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সঙ্গে খায়বারের যুদ্ধে যোগদানের উদ্দেশে রওনা হন। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জানতে পেরে আমাদেরকে ডেকে পাঠান। তিনি বললেন, তোমরা কার সঙ্গে এবং কার হুকুমে রওয়ানা হয়েছ? আমরা বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমরা এজন্য বেরিয়েছি যে, আমরা দড়ি পাকাব এবং তা দিয়ে আল্লাহর পথে যুদ্ধ করতে সাহায্য করব, আহতদের চিকিৎসার জন্য আমাদের কাছে ওষুধ রয়েছে, আমরা সৈন্যদের তীর-ধনুক এগিয়ে দেবো এবং তাদেরকে ছাতু তৈরি করে দেবো। তিনি বললেন ঠিক আছে, চলো। আল্লাহ তাঁর রসূলকে খায়বারের যুদ্ধে বিজয় দান করলেন। তিনি পুরুষদের ন্যায় আমাদেরকেও গনীমাতের ভাগ দেন। আবু দাউদ ২৭২৯

আরও জানা যায়, কয়েকজন সাহাবীর স্ত্রীগণও বেশ কয়েকটি সামরিক অভিযানে এবং যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন।

> নুসাইবা বিনতে কাব আনসারিয়া ওহুদ, বনি কুরাইজা হুদায়বিয়া, খায়বর, হুনাইন ও ইয়ামামার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।
>
> তাবকাতে ইবনে সাদ ৮ : ৪১৫, দালায়িলুন নবুয়্যাহ ২ : ৭১২

> শুধু তাই নয়, রসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উহুদের যুদ্ধে উম্মে আমারাহ'র পারফরমেন্সের ভুয়সী প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, উহুদের দিন ডানে-বামে যেদিকেই নজর দিয়েছি, উম্মে আমারকেই লড়াই করতে দেখেছি। তিনি যেভাবে যুদ্ধ করেন তা নজিরবিহীন। এক শত্রু সৈন্যের তরবারির কোপ পড়ল তার মাথায়। তিনি ঢাল দিয়ে তা প্রতিহত করলেন। তিনি আঘাত করলেন ওর ঘোড়ার পায়ের ওপর। অশ্ব ও অশ্বারোহী দুজনেই পড়ে গেল মাটিতে। মহানবী এ দৃশ্য দেখে তার পুত্র আবদুল্লাহ রদিয়াল্লাহু আনহু-কে সাহায্যের নির্দেশ দিলেন। তিনি পতিত সৈন্যকে শেষ করলেন। এলো অন্য এক শত্রু। সে আঘাত হানল আবদুল্লাহ রদিয়াল্লাহু আনহুর বাম বাহুতে। মা পুত্রের ক্ষতস্থান বেঁধে দিলেন। আর ছেলেকে আমৃত্যু লড়াই করার জন্য উদ্দীপ্ত করলেন। অপূর্ব এ দৃশ্য দেখে রসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হে উম্মে আম্মারাহ! তোমার মধ্যে যে শক্তি আছে, তা আর কার মধ্যে থাকবে?
>
> তাবাকাত ৮ : ৪১৫, সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা ২ : ২৮১

অন্যদিকে, হুনাইনের যুদ্ধে উম্মে সুলাইম রদিয়াল্লাহু আনহার অংশগ্রহণ এবং সে বিষয়ে রসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মন্তব্য জানা যায় তার ছেলে আনাস রদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদিস থেকে।

> আনাস রদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, হুনাইনের যুদ্ধে (আমার মা) উম্মে সুলাইমের হাতে খঞ্জর অর্থাৎ দুধারী লম্বা ছুরি দেখে রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে তা রাখার কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, যদি কাফের সৈন্য আমার নিকটবর্তী হয়, তবে এ দিয়ে আমি তার পেট ফেড়ে ফেলব। জবাব শুনে রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হেসে ফেলেন। মুসলিম ৪৭ : ১৮০৯

আরেকটি বর্ণনায় এভাবে এসেছে :

> আনাস রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। (তাঁর মা) উম্মু সুলায়ম হুনায়নের যুদ্ধের দিন একটি ছোরা ধারণ করেছিলেন, যা তার সঙ্গে থাকত। (তার স্বামী) আবু তালহা তা দেখতে পেয়ে বলেন, হে আল্লাহর রসূল! ইনি উম্মু সুলায়ম। আর তার সঙ্গে একটি ছোরা রয়েছে। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে বললেন এ ছোরা কিসের জন্য? তিনি বললেন, এটি এজন্য নিয়েছি যদি কোন বিধর্মী মুশরিক আমার কাছাকাছি আসে, তবে এ দিয়ে আমি তার পেট চিরে ফেলব। তখন রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাসতে লাগলেন। তখন তিনি (উম্মু সুলায়ম) বললেন, হে আল্লাহর রসূল! (মক্কা বিজয়ের দিন) যারা ছাড়া পেয়ে গেছে এবং পরাজয়ের মুখে ইসলাম গ্রহণ করেছে, তাদের হত্যা করে ফেলুন। তখন রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হে উম্মু সুলায়ম! আল্লাহই (মুশরিকদের বিরুদ্ধে) যথেষ্ট। তিনি (আমাদের প্রতি) সদয় রয়েছেন। মুসলিম ৪৫৩০ (ইসলামিক ফাউন্ডেশন)

রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সময়ের নারী সাহাবীরা শুধু মদিনায় নয়, দূরবর্তী সামরিক অভিযানে অংশ নিতে আগ্রহী ছিলেন। তারা ইসলামের বার্তাকে বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে দেয়ার জন্য পুরুষ সাহাবীদের সঙ্গে দূরের সাম্রাজ্যগুলোতেও যেতে চেয়েছিলেন।

> আনাস রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বদর ও উহুদের যুদ্ধে অংশ নেয়া সাহাবী হিরাম বিন মিলহান রদিয়াল্লাহু আনহু এবং সেলিম বিন মিলহান রদিয়াল্লাহু আনহু-এর বাড়িতে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। সেই সময়, বাড়িতে তাদের দুই বোন ও সাহাবী উম্মে সুলায়ম রদিয়াল্লাহু আনহা এবং উম্মু হিরামও ছিলেন। ঘুম ভাঙার পর রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আপন মনেই

হেসে ফেললেন। উম্মে হিরাম রদিয়াল্লাহু আনহা তখন রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রশ্ন করলেন, হে রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনি ঘুমের ভেতর কী দেখলেন যে, এভাবে হেসে ফেললেন। তখন রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তর দিলেন, আমি দেখলাম আমার উম্মতেরই কিছু ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য সাগর পাড়ি দিয়ে দূর অভিযানে যাচ্ছে। উম্মু হিরাম রদিয়াল্লাহু আনহা তখন রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললেন, হে রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আপনি আমার জন্য দুআ করুন যাতে আমিও সেই দলে শরীক থাকতে পারি। মুসলিম ১৯১২

উসমান রদিয়াল্লাহু আনহু-এর আমলে উম্মে হিরাম রদিয়াল্লাহু আনহা ঠিকই তার স্বামী উবাইদা বিন আস সামিত রদিয়াল্লাহু আনহুর সঙ্গে সাইপ্রাসের উদ্দেশ্যে সামরিক অভিযানে বের হন এবং সেখানেই যুদ্ধে ঘোড়ার ওপর বসে লড়াই করার সময় তিনি শাহাদাত বরণ করেন। ঐতিহাসিকদের বর্ণনা থেকে তাকে সেখানেই দাফন করার বিষয়ে তথ্য পাওয়া যায়। রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর যুগে নারীদের ভূমিকা এবং জেহাদে ও জেহাদী অভিযানে তাদের অংশগ্রহণ নিয়ে পরবর্তী সময়ে অসংখ্য গ্রন্থ রচিত হয়েছে।

সামাজিক দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রেও মুসলিম নারীরা তাদের সাহসী ভূমিকা পালন করেছেন। ভালো কাজের প্রচার করেছেন, সৎ কাজের আদেশ করেছেন এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রেখেছেন। অর্থাৎ আল্লাহ মুমিনের জন্য যে কাজগুলোকে নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন তারা সেগুলোই করেছেন। আল্লাহ বলেন :

وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۘ يَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَيُطِيْعُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ؕ اُولٰٓئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّٰهُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ۝

আর মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী একে অপরের সহায়ক। তারা ভালো কথার শিক্ষা দেয় এবং মন্দ থেকে বিরত রাখে, সলাত প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নির্দেশানুযায়ী জীবনযাপন করে। এদের উপরই আল্লাহর দয়া। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশীল, প্রজ্ঞাময়। সূরা আত তাওবা ৯ : ৭১

তাফসীরে ইবনে কাসীরে (১:৪৬৮) একটি মহিলার কথা জানা যায়। তিনি প্রকাশ্যে মসজিদে বিয়ের দেনমোহর নিয়ে দ্বিতীয় খলিফা উমার রদিয়াল্লাহু আনহু-এর

সঙ্গে বিতর্কে লিপ্ত হয়েছিলেন। দেনমোহরের বিষয়ে উমার রদিয়াল্লাহু আনহু খুতবায় যে বর্ণনা দিয়েছিলেন, ওই মহিলা তা থেকে ভিন্ন মতামত প্রদান করেন। তার কথা এতটাই যৌক্তিক ছিল যে, খলিফা নিজেই তার বক্তব্য ফিরিয়ে নিয়ে মহিলার দেয়া মতামতকে সঠিক বলে প্রকাশ্যে ঘোষণা দেন। উমার রদিয়াল্লাহু আনহু এমনও বলেছিলেন, সবাই আমার থেকে বেশি জানে, শুধু আমিই কম জানি। শুধু তাই নয়, উমার রদিয়াল্লাহু আনহু খেলাফতের সময়ই আশ-শিফা বিনতে আবদুল্লাহকে বাজার তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্ব প্রদান করা হয়।

কুরআনের আয়াতগুলোকে পর্যালোচনা করে এবং রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সীরাতকে বিশ্লেষণ করে আমরা নারী বিষয়ক কার্যক্রমগুলোর বিষয়ে তেমন কোনো শক্ত প্রতিবন্ধকতা পাই না। অবশ্য এরপরও কিছু মানুষ নারী ও পুরুষের মাঝে অনেক বেশি ব্যবধান তৈরি করে রাখতে চায়।

উল্লেখ্য, মূসা আলাইহিস সালাম একদম তরতাজা যুবক থাকা অবস্থায় মাদইয়ান অঞ্চলের বৃদ্ধ এক ব্যক্তির দুই মেয়ের সঙ্গে কথা বলেছিলেন। মূসা আলাইহিস সালাম তাদেরকে প্রশ্ন করেছিলেন আর তারাও কোনো ধরনের অপরাধবোধে না ভুগে, বিব্রত না হয়ে বরং উদারচিত্তে প্রশ্নগুলোর উত্তর দিয়েছিল। নবী মূসা আলাইহিস সালাম তাদেরকে সহযোগিতাও করেছিলেন। এদের মধ্যে একজন বাড়িতে ফিরে তার পিতাকে সব জানায় এবং পিতার পক্ষ থেকে দাওয়াত নিয়ে মূসা আলাইহিস সালামকে তাদের বাড়িতে আসার আমন্ত্রণ জানায়। আর অন্যজন তার পিতাকে পরামর্শ দেয় মূসা আলাইহিস সালামকে তাদের বাসায় চাকরি দিয়ে রেখে দিতে। কেননা তার বিবেচনায় মূসা আলাইহিস সালাম শারীরিকভাবেও ছিলেন পরিশ্রমী আর মানুষ হিসেবে ছিলেন অনেক বেশি সৎ। কুরআনে বর্ণিত হয়েছে :

وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ ۖ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا ۖ قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّىٰ يُصْدِرَ الرِّعَاءُ ۖ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ - فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ - فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا ۚ فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ ۖ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ - قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ○

> যখন তিনি মাদইয়ানের কূপের ধারে পৌছলেন, তখন কূপের কাছে একদল লোককে পেলেন তার পশুদেরকে পানি পান করানোর কাজে ব্যস্ত। এবং তাদের পিছনে দুজন মহিলাকে দেখলেন তারা তাদের পশুদেরকে আগলিয়ে রাখছে। তিনি বললেন, তোমাদের কি ব্যাপার? তারা বলল, রাখালরা তাদের পশুদেরকে নিয়ে সরে না যাওয়া পর্যন্ত আমরা আমাদের পশুদেরকে পানি পান করাতে পারি না। আমাদের পিতা খুবই বৃদ্ধ। এরপর মূসা তাদের পশুদেরকে পানি পান করালেন। এরপর তিনি ছায়ার দিকে সরে গেলেন এবং বললেন, হে আমার রব! তুমি আমার প্রতি যে অনুগ্রহ নাযিল করবে, আমি তার মুখাপেক্ষী। এরপর বালিকাদ্বয়ের একজন লজ্জাজড়িত পদক্ষেপে তাঁর কাছে এল। বলল, আমার পিতা আপনাকে ডাকছেন, আপনি যে আমাদের পশুগুলিকে পানি পান করিয়েছেন, তার প্রতিদান প্রদান করবেন। এরপর মূসা যখন তাঁর কাছে গেলেন এবং সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করলেন। তখন তিনি বললেন, ভয় কোরো না, তুমি জালিম সম্প্রদায়ের কবল থেকে রক্ষা পেয়েছ। বালিকাদ্বয়ের একজন বলল, পিতা! তাকে সেবক হিসেবে নিয়োগ করুন। কেননা, আপনার সেবক হিসেবে তিনি উত্তম হবেন, তিনি যোগ্যতাসম্পন্ন ও বিশ্বস্ত। সূরা আল কাসাস ২৮ : ২৩-২৬

পাশাপাশি, মারইয়াম আলাইহিস সালাম-এর ঘটনাও প্রণিধানযোগ্য। যখন যাকারিয়া আলাইহিস সালাম তার ঘরে এসে প্রচুর পরিমাণ খাবার দেখলেন। তখন তিনি এ খাবারের উৎস সম্পর্কে জানতে চাইলেন। আল্লাহ্ বলেন :

كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا ۖ قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّىٰ لَكِ هَٰذَا ۖ
قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ۖ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ○

> যখনই যাকারিয়া মেহরাবের মধ্যে তার কাছে আসতেন তখনই কিছু খাদ্য দেখতে পেতেন। জিজ্ঞেস করতেন মারইয়াম, কোথা থেকে এসব তোমার কাছে এল? তিনি বলতেন, এসব আল্লাহর কাছ থেকে আসে। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা পর্যাপ্ত রিযিক দান করেন। সূরা আলে ইমরান ৩ : ৩৭

আরেকটি বর্ণনা পাওয়া যায় সাবার রাণীকে নিয়ে। কুরআন থেকে জানা যায়, সুলাইমান আলাইহিস সালাম-এর বার্তা পাওয়ার পর তিনি তার সভাষদের সঙ্গে পরামর্শ করলেন যে, কিভাবে তিনি এর প্রতিক্রিয়া জানাবেন।

قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّىٰ
تَشْهَدُونِ - قَالُوا نَحْنُ أُولُو قُوَّةٍ وَأُولُو بَأْسٍ شَدِيدٍ وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ

فَانْظُرِىْ مَاذَا تَأْمُرِيْنَ - قَالَتْ اِنَّ الْمُلُوْكَ اِذَا دَخَلُوْا قَرْيَةً اَفْسَدُوْهَا
وَجَعَلُوْٓا اَعِزَّةَ اَهْلِهَآ اَذِلَّةً ۚ وَكَذٰلِكَ يَفْعَلُوْنَ ○

বিলকিস বলল, হে পারিষদবর্গ! আমাকে আমার কাজে পরামর্শ দিন। আপনাদের অভিমত ছাড়া আমি কোন কাজের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি না। তারা বলল, আমরা শক্তিশালী এবং কঠোর যোদ্ধা। এখন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা আপনারই। অতএব আপনি ভেবে দেখুন, আমাদেরকে কি আদেশ করবেন। সে বলল, রাজা-বাদশারা যখন কোনো জনপদে প্রবেশ করে, তখন তাকে বিপর্যস্ত করে দেয় এবং সেখানকার সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গকে অপদস্থ করে। তারাও এরকমই করবে। সূরা আন নামল ২৭ : ৩২-৩৪

তারপর সাবার রাণী বিলকিস যখন সুলাইমান আলাইহিস সালাম-এর দরবারে পৌঁছায় তখন তার সঙ্গে নবী সুলাইমান আলাইহিস সালাম-এর আলোচনা যেভাবে অগ্রসর হয় তা কুরআনে এসেছে :

فَلَمَّا جَآءَتْ قِيْلَ اَهٰكَذَا عَرْشُكِ ؕ قَالَتْ كَاَنَّهٗ هُوَ ۚ وَاُوْتِيْنَا الْعِلْمَ مِنْ
قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِيْنَ - وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَّعْبُدُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ اِنَّهَا
كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كٰفِرِيْنَ - قِيْلَ لَهَا ادْخُلِى الصَّرْحَ ۚ فَلَمَّا رَاَتْهُ حَسِبَتْهُ
لُجَّةً وَّكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا ؕ قَالَ اِنَّهٗ صَرْحٌ مُّمَرَّدٌ مِّنْ قَوَارِيْرَ ۬ؕ قَالَتْ رَبِّ
اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ وَاَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمٰنَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○

এরপর যখন বিলকিস এসে গেল, তখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো, তোমার সিংহাসন কি এরকম? সে বলল, মনে হয় এটা সেটাই। আমরা পূর্বেই সবকিছু জেনে গেছি এবং আমরা অনুগতও হয়ে গেছি। আল্লাহর পরিবর্তে সে যার ইবাদত করত, সেই তাকে ঈমান থেকে নিবৃত্ত করেছিল। নিশ্চয়ই সে কাফের সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাকে বলা হলো, এই প্রাসাদে প্রবেশ করো। যখন সে ওটার প্রতি দৃষ্টিপাত করল, সে ধারণা করল যে, এটা স্বচ্ছ গভীর জলাশয়। সে তার পায়ের গোছা খুলে ফেলল। সুলায়মান বলল, এটা তো স্বচ্ছ স্ফটিক নির্মিত প্রাসাদ। বিলকিস বলল, হে আমার রব! আমিতো নিজের প্রতি জুলুম

করেছি। আমি সুলায়মানের সঙ্গে জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করলাম। সূরা আন নামল ২৭ : ৪২-৪৪

এটা বলা ঠিক হবে না যে, পূর্ববর্তী জাতিগুলোর বিষয়াবলী আমাদের জন্য প্রযোজ্য নয়। কেননা, তাদের ঘটনাবলী কুরআনে বার বার এজন্যই এসেছে যাতে আমরা এসব ঘটনা থেকে হেদায়েত পাওয়ার চেষ্টা করি, সত্যকে অনুধাবন করার চেষ্টা করি।

তাছাড়া যেহেতু আমাদের বাস্তবতায় এমন কিছু ঘটছে না, কিংবা এমন কোনো প্রমাণও নেই, যা দিয়ে আমরা পূর্ববর্তী জাতি সম্পর্কে কুরআন ও হাদিসে বর্ণিত ঘটনাবলীকে অস্বীকার করতে পারব, বরং গোটা পৃথিবী জুড়েই পূর্ববর্তী জাতিগুলোর অসংখ্য নিদর্শনও বিদ্যমান, সেজন্য বিষয়গুলোকে ইতিবাচকভাবে গ্রহণ করাই বাঞ্ছনীয়। আল্লাহ সে কারণেই রসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উদ্দেশ্য করে বলেন :

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ

এরাই তারা যাদেরকে আল্লাহ পথ প্রদর্শন করেছিলেন। অতএব, আপনিও তাদের পথ অনুসরণ করুন। সূরা আল আনআম ৬ : ৯০

এটা বাস্তব যে, ইসলামের প্রথম যুগে যদি কোনো নারীর বিরুদ্ধে যিনা বা ব্যভিচারের অভিযোগ পাওয়া যেত তাহলে শাস্তি স্বরূপ তাকে একটি ঘরে ততদিন আটকে রাখা হতো যতদিন না তার মৃত্যু হয় অথবা আল্লাহ নিজে তার শাস্তি নিরসনের কোনো পথ বের করে না দেন। আল্লাহ বলেন :

وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ ۖ فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ۝

আর তোমাদের নারীদের মধ্যে যারা ব্যভিচারিণী তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের মধ্য থেকে চারজন পুরুষকে সাক্ষী হিসেবে তলব করো। এরপর যদি তারা সাক্ষ্য প্রদান করে তবে সংশ্লিষ্টদেরকে গৃহে আবদ্ধ রাখ, যে পর্যন্ত মৃত্যু তাদেরকে তুলে না নেয় অথবা আল্লাহ তাদের জন্য অন্য কোনো পথ নির্দেশ না করেন। সূরা আন নিসা ৪ : ১৫

এ দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায় যে, কোনো সতী নারীকে ঘরে আটকে রাখার ইসলাম কর্তৃক মোটেও অনুমোদিত নয় বরং অযৌক্তিক। এটা হবে অপরাধ ছাড়াই তাকে শাস্তি দেয়ার সমান। ইসলামের পরবর্তী সময়ে ব্যভিচারের শাস্তি পরিবর্তিত হয়। সংশোধিত নিয়ম অনুযায়ী অবিবাহিত দম্পতিকে বেত্রাঘাত আর বিবাহিতদের জন্য পাথর ছুঁড়ে হত্যা করার বিধান চালু হয়।

সংক্ষেপে বলতে গেলে, নারী ও পুরুষের মেলামেশা ও দেখা সাক্ষাত নিষিদ্ধ নয়। এটা অনুমোদিত। আর যদি মহৎ উদ্দেশ্য থাকে, তাহলে এ ধরনের সাক্ষাত বরং অতীব প্রয়োজনীয়। যেমন, জ্ঞান অর্জনের জন্য অথবা কল্যাণজনক কোনো কার্যক্রম যৌথভাবে পরিচালনার জন্য নারীরা যদি পুরুষদের কাছে যেতে চায়, তাহলে তা অনুমোদন দিতে হবে।

৩.৩ অনিয়ন্ত্রিত মেলামেশার পক্ষে অযাচিত বিতর্ক

এতক্ষণ আমরা নারী ও পুরুষের মেলামেশার বিষয়ে যে তথ্যগুলো উপস্থাপন করেছি মূলত এই মেলামেশার বিষয়ে ইসলামের প্রকৃত অবস্থান এমনই। ইসলাম নারী ও পুরুষকে দান-সদাকা এবং নেক আমল করার অভিপ্রায়ে একসঙ্গে কাজ করার সুযোগ করে দিয়েছে। যদিও সাম্প্রতিক কালে বুদ্ধিবৃত্তিক সাম্রাজ্যবাদ আমাদের দেশে এমন কিছু মানুষ তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে, যারা এখন আল্লাহর হুকুম আর রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাহকে অগ্রাহ্য করার ধৃষ্টতা দেখাতে পারছে।

এ মানুষগুলো এখন আমাদেরকে উস্কানি দিচ্ছে যাতে আমরা নারীদেরকে তাদের ভাষায় স্বাধীনতা দেই। তার ব্যক্তিত্বকে বিকশিত হওয়ার সুযোগ দেই। তারা আরো বলে, নারীরা যেন তাদের জীবন ও নারীত্বকে ভোগ করার অবকাশ দেয়া হয়, সে দাবিও তারা তুলছেন।

তারা চায়, নারীরা পুরুষদের সঙ্গে খোলামেলা মিশবে, পুরুষের সঙ্গকে উপভোগ করবে, তারা নির্জনে বা একান্তে সময় কাটাবে, পুরুষের সঙ্গে মিলে এখানে সেখানে ভ্রমন করবে। একসঙ্গে সিনেমা দেখবে, নাচবে ইত্যাদি।

কেউ কেউ এমনও বলছে, নারীদেরকে পুরুষদের সঙ্গে খোলামেলা মেশার সুযোগ দেয়া প্রয়োজন যাতে তারা জীবনসঙ্গী হিসেবে সঠিক মানুষটিকে বেছে নিতে পারে। বলা হচ্ছে, এভাবেই একজন নারীর জীবন অনেক বেশি নিরাপদ হয়ে উঠবে এবং শত প্রতিকূলতার মাঝেও স্থিতিশীল থাকবে।

এসব বক্তব্য প্রদানকারীরা নিজেদেরকে তো বটেই, এমনকি নারী ও পুরুষকেও নিষ্কলুষ ও পবিত্র দেবদূত বলে মনে করছে। তারা দাবি করছেন, নারী ও

পুরুষের এই অবাধ মেলামেশা নিয়ে চিন্তিত হওয়ার কিছু নেই। এগুলো সবই মার্জিত যোগাযোগ, নিষ্পাপ বন্ধুত্ব এবং উন্নত সম্পর্কের বহিঃপ্রকাশ। বরং এ ধরনের যোগাযোগ ও অবাধ মেলামেশাটাই সমাজে কাঙ্ক্ষিত শান্তির সুবাতাস নিয়ে আসবে। তারা মনে করছেন, ঘন্টার পর ঘন্টা আলাপ বা একসঙ্গে নাচ-গান, এসব কিছুই নারী ও পুরুষের মাঝে তাদের পরস্পরের বিষয়ে নান্দনিক ভাবমূর্তি তৈরি করবে। তারা মনে করেন, এভাবে মেলামেশার সুযোগ পেলেও নারী ও পুরুষ শুধুমাত্র চোখের দেখাতেই সন্তুষ্ট থাকবে, কিংবা শুধু কথা বলেই তারা ক্ষান্ত হবে।

কিন্তু কেবল ইন্দ্রিয়জাত আনন্দ ভোগ করার কোনো সুযোগ ইসলামে নেই। এর মাধ্যমে শক্তির অপচয় ছাড়া আর কিছুই হয় না। পশ্চিমারা বিগত বছরগুলোতে নির্জনতা আর প্রাইভেসির নামে যা করেছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে একথা এখন নিশ্চিতভাবেই বলা যায়।

৩.৪ অনাকাঙ্ক্ষিত বিতর্ক পরিহার

এসব অযাচিত বিতর্কের বিষয়ে আমাদের প্রথম উত্তর হলো, আমরা সবার আগে মুসলিম। আমরা পশ্চিমাদের বা প্রাচ্যের অন্ধ প্রচারণার কাছে নিজেদের ধর্মকে বিক্রি করে দিতে পারি না। যে সম্পর্কের ফলশ্রুতিতে পরস্পরকে দেখার সুযোগ হয় এবং অবাধ যৌনাচারের পথ উন্মুক্ত হয়, ইসলাম তা স্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ করেছে। আল্লাহ বলেন :

ثُمَّ جَعَلْنٰكَ عَلٰى شَرِيْعَةٍ مِّنَ الْاَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَ
الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ○

এরপর আমি আপনাকে রেখেছি ধর্মের এক বিশেষ শরীয়তের উপর। অতএব, আপনি এর অনুসরণ করুন কিন্তু অজ্ঞানদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করবেন না।
সূরা আল জাসিয়া ৪৫ : ১৮

পরের আয়াতে আল্লাহ আরও বলেন :

اِنَّهُمْ لَنْ يُّغْنُوْا عَنْكَ مِنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا ؕ وَاِنَّ الظّٰلِمِيْنَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ وَ
اللّٰهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِيْنَ - هٰذَا بَصَآئِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ ○

আল্লাহর সামনে তারা আপনার কোনো উপকারে আসবে না। জালিমরা একে অপরের বন্ধু। আর আল্লাহ মুত্তাকীদের বন্ধু। এটা মানুষের জন্যে জ্ঞানের কথা এবং বিশ্বাসী কওমের জন্য হেদায়েত ও রহমত। সূরা আল জাসিয়া ৪৫ : ১৯-২০

পশ্চিমারা তাদের এসব ভ্রান্ত ধারণাকে ভর করে চলার কারণে অপচয় এবং নৈতিকতার অবক্ষয়সহ নানা ধরনের সমস্যা মোকাবেলা করছে। এ প্রবৃত্তিগুলো পশ্চিমা যুবসমাজকে বিপদগ্রস্ত করছে এবং সার্বিকভাবে গোটা সভ্যতাকেই পতনের দারপ্রান্তে নিয়ে যাচ্ছে। আমেরিকা, সুইডেন এবং আরো বেশ কিছু দেশে যেখানে অবাধে যৌনতায় সম্পৃক্ত হওয়ার সুযোগ আছে, সেখানকার কিছু পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় যে, নারী ও পুরুষের মেলামেশা শুধু কথা আর যোগাযোগে সীমাবদ্ধ থাকছে না। তাদের প্রবৃত্তির কামনা এভাবে নিবৃত না হওয়ায় তারা বরং সম্পর্কের আরো গভীরে চলে যাচ্ছে। অন্যদিকে, মানুষ যত বেশি স্বাদ পায়, আরো বেশি তার প্রতি আকৃষ্ট হয়।

তাই শুধু স্বাধীনতার কথা না বলে আমরা যেন এর পরিণতির বিষয়টি নিয়েও ভাবি। তাহলে তা আমাদের জন্য কল্যাণকর হবে। বর্তমান পশ্চিমা সভ্যতায় উদারতার নামে যা ঘটছে, যেভাবে নৈতিক ও ধর্মীয় গুণাবলিকে নির্বাসনে পাঠানো হয়েছে, সেই বাস্তবতা বিবেচনায় রাখা জরুরি।

৪

অবাধ মেলামেশার প্রভাব

সাম্প্রতিক সময়ে যেসব জরিপ ও পরিসংখ্যান আমাদের সামনে এসেছে তাতে নারী ও পুরুষের অবাধ মেলামেশার নেতিবাচক প্রভাবের বিষয়টি বেশ প্রকট ও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। যৌন স্বাধীনতা আর যৌন বিপ্লবের ফলশ্রুতিতে নারী ও পুরুষের মধ্যকার দেয়ালটি অনেকাংশেই ভেঙে পড়েছে। পরিণতিতে যা ঘটছে তার কিছু প্রভাব নিম্নে আলোচনা করা হলো।

৪.১ নৈতিক অবক্ষয়

অবাধ যৌনতা ও মেলামেশার কারণে নৈতিকতার ব্যাপক পতন ঘটেছে। মানুষ এখন তার প্রবৃত্তি ও অযাচিত কামনা বাসনার দাসে পরিণত হয়েছে। মানবিকতার ওপর পশুবৃত্তির জয় হয়েছে। সতীত্বের ধারণা বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। নারী ও পুরুষের মাঝে যে সহজাত লাজুকতা ছিল তাও অনেকটা বিলীন হয়েছে। গোটা সমাজে সার্বিকভাবেই অনেকগুলো সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। ১৯৬২ সালের একটি বিখ্যাত ভাষণে তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জন এফ কেনেডি বলেন, মার্কিন যুবকরা এখন নৈতিকভাবে অবক্ষয়ের শিকার, তাদের সব বাঁধন খুলে গেছে, তারা এখন আবেগের দাস। ফলে, প্রতি সাত জনের মধ্যে ছয় জন যুবকই সেনাবাহিনীতে যোগ দেয়ার মতো শারীরিক সক্ষমতা ধারণ করে না। কারণ তারা শুধু নিজেদের প্রবৃত্তিকেই সন্তুষ্ট করে যায়। প্রেসিডেন্ট কেনেডির ভাষণে, যুবকদের সেই পচনের বিষয়ে তাদেরকে সতর্কও করেছিলেন।

হার্ভার্ডের গবেষণা কেন্দ্রের পরিচালক পিট্রিম সোরোকিন তার 'সোশ্যাল এন্ড কালচারাল ডাইনামিকস' বইতে যৌন বিপ্লব তথা সেক্সুয়াল রেভলিউশন প্রসঙ্গে বলেন, 'মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ক্রমশই যৌনতার দিক থেকে একটি নৈরাজ্যকর পরিস্থিতির দিকে অগ্রসর হচ্ছে। ইতোপূর্বে রোমান ও গ্রীকরা যেভাবে যৌনতার হাত ধরে পতনের দিকে চলে গিয়েছিল, অনেকটা সেরকমভাবেই আমেরিকানরা যৌনতার লালসায় এমনভাবে বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়েছে যা ক্রমান্বয়ে তাদের সংস্কৃতিসহ জীবনের সকল খাতকেই ক্ষতিগ্রস্ত করছে।'

যদিও আপাতদৃষ্টিতে কম্যুনিস্টরা এসব বিষয়ে অনেক সচেতন এবং মিডিয়ায় সংবাদ প্রচারের বিষয়েও তাদের খবরদারি অনেক বেশি, তারপরও ১৯৬২ সালে তৎকালীন কম্যুনিস্ট নেতা ক্রুশ্চেভ ঘোষণা করেছিলেন যে, তাদের যুবকরা অনেকটাই পথভ্রষ্ট হয়ে পড়েছে এবং তারা বিলাসিতার ফাঁদে আটকা পড়েছে।

তিনি একটি পর্যায়ে বিপথগামী যুবকদেরকে ফিরিয়ে আনার জন্য সাইবেরিয়াতে কনসেনট্রেশন ক্যাম্প চালু করারও হুমকি দিয়েছিলেন। তেমনটা তিনি করতে পারেননি তবে বাস্তবতা হলো, সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের জন্য এই পথভ্রষ্ট আর বিকৃত রুচির যুবক যুবতীদের দায়ও কম নয়।

৪.২ অবৈধ সন্তান

প্রবৃত্তির কামনা বাসনা অন্ধভাবে অনুসরণ করার সুযোগ থাকায় এবং নারী ও পুরুষের মেলামেশার ক্ষেত্রে কোনো প্রতিবন্ধকতা না থাকায় বিভিন্ন দেশে ও সমাজে অবৈধ তথা পিতৃ পরিচয়হীন সন্তানের সংখ্যা আশঙ্কাজনকভাবে বেড়ে যাচ্ছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে স্কুলগামী মেয়েদের মধ্যে গর্ভবতী হওয়ার পরিমাণ মারাত্মকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। একটি পত্রিকায় প্রকাশিত পরিসংখ্যান থেকে জানা যায়, ১৯৮৩ সালে দেশটিতে যতজন শিশু জন্ম নিয়েছিল তার মধ্যে এক তৃতীয়াংশই অবৈধ। এদের অধিকাংশের মায়েরাই কিশোরী। ঐ একটি বছরেই অবৈধ সন্তানের মোট সংখ্যা ছিল ১ লাখ ১২ হাজার ৩৫৩ জন। যা সেই বছরে জন্ম নেয়া মোট শিশু সংখ্যার ৩৭ শতাংশ।

৪.৩ বিয়ে বিমুখতা

বিয়ে এবং পরিবারের অনুমোদন ছাড়াই যৌন সম্পর্ক করার সুযোগ থাকায় অনেক যুবক-যুবতী একাধিক ব্যক্তির সঙ্গে যৌন সম্পর্কে জড়িয়ে পড়তে পারছে। তারা মনে করছে, এই পদ্ধতিতে তারা নিয়মিতভাবে ভিন্ন ভিন্ন মানুষের সঙ্গে মেশার আনন্দ ভোগ করবে। অথচ কোনো বন্ধন থাকবে না। জীবনের কোনো একঘেয়েমি আসবে না। বিবাহিত জীবনের দায়বদ্ধতা কাঁধে নিতে হবে না। পিতৃত্বের দায়িত্বও পালন করার প্রয়োজন পড়বে না। এভাবে অসংখ্য নারী যৌন সম্পর্ক করে ফেলার পরও স্বামীর সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। নিজেদের অবৈধ সম্পর্কের অবৈধ খেসারতের দায় এড়াতে গিয়ে তারা নিশ্চিত নিরাপদ ও সম্মানজনক জীবনযাপনের সুযোগও পাচ্ছেন না। একইভাবে অসংখ্য যুবক শান্তিপূর্ণ জীবনযাপন থেকে বঞ্চিত হয়ে আছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রকাশিত জরিপে এই শতকে প্রথমবারের মতো দেখা যাচ্ছে যে, সানফ্রান্সিসকোতে অধিকাংশ বাসিন্দাই এখন অবিবাহিত অবস্থায় রয়েছেন। সেখানকার জনগনের ৫৩ ভাগ এখনও অবিবাহিত। এই পরিসংখ্যানটি প্রকাশ করেছিলেন ব্রুস চ্যাপম্যান। তার মতে এই চিত্র ইঙ্গিত করছে যে, প্রথাগত পারিবারিক পদ্ধতিটি এখন অনেকটাই ভাঙ্গনের মুখে। তিনি অবশ্য নিজেও পারিবারিক প্রথাবিরোধী মানুষ। তাই তার দৃষ্টিতে সমাজে অবিবাহিত লোকের

সংখ্যা বৃদ্ধির বিষয়টি সামাজিক পরিবর্তনের মানদন্ড হিসেবে ভীষণ ইতিবাচক। কেননা, শহরে ৪০ শতাংশ বাসিন্দার বয়স ২৫-৩৪ এর মধ্যে, আর তারা এ ধরনের জীবনযাপনেই বেশি আগ্রহী। এই পরিসংখ্যানে অবশ্য সমকামীদের বিষয়ে কিছু বলা হয়নি, যাদের সংখ্যাও মোট জনসংখ্যার প্রায় ১৫ শতাংশ।

পশ্চিমা দেশগুলোতে যৌনতার দিক থেকে যেভাবে অবক্ষয় ঘটছে তাতে এটাই স্বাভাবিক যে, মানুষ সেখানে আরো বেপরোয়া হয়ে উঠবে। উদাহরণ হিসেবে সুইডেনের কথা বলা যায়। সেখানে প্রায় এক লাখ নারী সাম্প্রতিক সময়ে মিছিল ও সমাবেশ করেছে, যাদের একমাত্র দাবি ছিল তারা অবাধ যৌন স্বাধীনতা উপভোগ করতে চায়। নিশ্চয়ই নারীবাদী প্রতিষ্ঠান ও সংস্থাগুলো নিজেদের স্বার্থে অন্যান্য নারীদেরকে এ জাতীয় সমাবেশ করার জন্য প্ররোচিত করেছে।

৪.৪ ডিভোর্সের উচ্চহার ও পরিবারে ভাঙ্গন

বর্তমানে এসব নেতিবাচক বাস্তবতার কারণে শুধুমাত্র বিবাহ পদ্ধতিই যে হুমকির মুখে পড়েছে তা নয় বরং বিয়ের পর তা টিকিয়ে রাখাও ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়েছে। পরিবারগুলো একে একে ধ্বসে পড়ছে। সামান্য সমস্যা বা মনোমালিন্যের কারণেও বন্ধনগুলো তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ছে। পশ্চিমা প্রতিটি দেশে ডিভোর্সের হার এখন অতীতের সকল রেকর্ড ভঙ্গ করেছে।

৪.৫ মরণ ব্যাধির প্রসার

যৌন সংক্রামক ব্যাধিগুলো এবং এর পাশাপাশি নানা ধরনের স্নায়বিক, মানসিক ও মনস্তাত্ত্বিক রোগগুলো সাম্প্রতিক সময়ে মহামারি আকারে ছড়িয়ে পড়ছে। অবাধ যৌনাচারকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন জটিলতা ও অসুবিধা তৈরি হচ্ছে যা আগে কখনোই শোনা যায়নি। এর মধ্যে একটি হলো এইডস নামক রোগের বিস্তার। এইচআইভি ভাইরাসের কারণেই এই মরণঘাতি রোগ বিস্তৃত হচ্ছে। এই ভাইরাসটি শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে ক্রমান্বয়ে নষ্ট করে দেয় এবং শরীরকে যেকোনো ধরনের সমস্যার জন্য উপযোগী বানিয়ে দেয়। লক্ষ কোটি মানুষ এখন এই ভয়ংকর রোগের আশঙ্কায় দিন পার করছে। আর এ বাস্তবতা হাদিসের সত্যতাই প্রমাণ করে।

> রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যখন একটি সমাজে ব্যাভিচার, লাম্পট্য ও বেহায়াপনা বেড়ে যায় তখন সেখানে নানা ধরনের মহামারি ও মরণব্যাধির আবির্ভাব হয়। **ইবনে মাজাহ ৪০১৯**

শুধু শারীরিক সমস্যাই নয়, পশ্চিমা দেশগুলোতে মানসিক ও মনস্তাত্ত্বিক রোগে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যাও মারাত্মকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। হাসপাতাল আর

আশ্রয়কেন্দ্রগুলো এ জাতীয় রোগী দিয়ে ভরে যাচ্ছে।

ফ্রয়েড এবং তার অনুসারী মনোবিজ্ঞানীরা দাবি করেছিলেন যে, যৌনাচারের ওপর থেকে প্রথাগত প্রতিবন্ধকতাগুলোকে তুলে নেয়া হলে মানুষের স্নায়ুর ওপর চাপ কমবে। অযাচিত জটিলতা হ্রাস পাবে এবং অন্তর এক ধরনের স্বস্তি ও প্রশান্তি অনুভব করবে। তাদের সুপারিশ অনুযায়ী, সব ধরনের নিষেধাজ্ঞা পর্যায়ক্রমে তুলে নেয়া হয়েছে, প্রবৃত্তি ও কামনাকে মুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু ফল হয়েছে উলটো। মানুষের জীবনে জটিলতা আরো বেড়েছে। স্নায়ুগুলোর উদ্বিগ্নতার চাপে আটকা পড়েছে। আর উৎকণ্ঠা ও টেনশন মানুষের জীবনের নিত্যদিনের সঙ্গী হয়ে পড়েছে। হাজার হাজার নতুন হাসপাতাল চালু করেও এই সমস্যা মোকাবেলা করা সম্ভব হচ্ছে না।

এটা বিশ্বাস করতেও কষ্ট হয়। যেখানে আল্লাহ আমাদের অবাধ মেলামেশার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন, সেখানে আমাদেরকেই করুণ চোখে এই অননুমোদিত মেলামেশা আর এর প্রভাবকে অবলোকন করতে হচ্ছে।

৫

নারী যখন মা

৫.১ মাতৃত্ব

নারীকে একজন মানুষ প্রথম দেখার সুযোগ পায় একজন মা হিসেবে। সেই মা, যিনি অস্বাভাবিক কষ্ট করে গর্ভে ধারণ করেন, প্রচণ্ড প্রসব বেদনা সহ্য করে সন্তান জন্ম দেন, তারপর সন্তানকে আদর করে বড় করেন এবং পরম মমতায় সেবা করেন।

ইসলাম যেভাবে একজন মাকে সম্মান দিয়েছে, পৃথিবীর ইতিহাসে দ্বিতীয় এমন কোনো ধর্ম ও পদ্ধতিকে পাওয়া যায় না, যারা ততটা সম্মান দিতে পেরেছে। আল্লাহর হুকুম মানা ও আল্লাহর আনুগত্যের আদেশ দেয়ার পরপরই ইসলাম যার আদেশ মানতে বলেছে, তিনি হলেন মা।

আল্লাহ মাতৃসেবাকে একটি নেক আমল হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। আল্লাহ মায়ের অধিকার ও সম্মানকে পিতার চেয়ে বৃদ্ধি করে দিয়েছেন। কেননা, মা-ই হলেন সেই মানুষ যিনি গর্ভধারণের সময়, সন্তান প্রসবের সময়, শিশু সন্তানকে সেবা করার সময় এবং সর্বোপরি একজন সন্তানকে লালন পালন করার সময় সবচেয়ে বেশি ত্যাগ স্বীকার করেন এবং কষ্ট করেন। কুরআন মাজিদে বারবার মায়ের সম্মান, মায়ের প্রতি সন্তানের অধিকার ও কর্তব্যকে উপস্থাপন করা হয়েছে, যাতে একজন মানুষের মনে ও মাথায় বিষয়টি স্থায়ীভাবে গেঁথে যায়। যেমন, আল্লাহ বলেন :

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ ۚ حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ وَهْنًا عَلٰى وَهْنٍ وَّفِصٰلُهٗ فِىْ
عَامَيْنِ اَنِ اشْكُرْ لِىْ وَلِوَالِدَيْكَ ۗ اِلَىَّ الْمَصِيْرُ ○

আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করার জন্য জোর নির্দেশ দিয়েছি। তার মা তাকে কষ্টের পর কষ্ট করে গর্ভে ধারণ করেছে। তার দুধ ছাড়ানো হয় দুবছরে। নির্দেশ দিয়েছি যে, আমার প্রতি ও তোমার পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। অবশেষে তোমাদেরকে আমারই কাছে ফিরে আসতে হবে।
সূরা লোকমান ৩১ : ১৪

আল্লাহ আরও বলেন :

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ اِحْسٰنًا ۗ حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ كُرْهًا وَّوَضَعَتْهُ

كُرْهًا ۖ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ۚ

আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহারের আদেশ দিয়েছি। তার মা তাকে কষ্টসহকারে গর্ভে ধারণ করেছে এবং কষ্টসহকারে প্রসব করেছে। তাকে গর্ভে ধারণ করতে ও তার দুধ পান ছাড়াতে লেগেছে ত্রিশ মাস।

সূরা আল আহক্বাফ ৪৬ : ১৫

আবু হুরায়রা রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে এসে জিজ্ঞাসা করল, হে আল্লাহর রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! কে আমার উত্তম আচরণ পাওয়ার বেশি হকদার? তিনি বললেন, তোমার মা। সে বলল, তারপর কে? তিনি বললেন, তোমার মা। সে আবারও বলল, তারপর কে? তিনি বললেন, তোমার মা। সে পুনরায় বলল, এরপর কে? তিনি বললেন, তোমার পিতা। বুখারি, মুসলিম, আবু লুলু ওয়াল মারজান ১৬৫২

আল বাজ রহমাতুল্লাহি আলাইহি আরেকটি ঘটনার কথাও সামনে এনেছেন। বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি তার বৃদ্ধ মাকে হারাম শরীফে নিয়ে আসে। সে তাকে তার কাঁধে নিয়ে কাবা শরীফের চারপাশে তাওয়াফ করতে থাকে। সে রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দেখতে পেয়ে জিজ্ঞাসা করল, আমি কি এখন আমার মায়ের প্রতি কর্তব্য পালন করেছি? রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তর দিলেন, তুমি তোমার মায়ের একটি শ্বাস-প্রশ্বাসের হকও আদায় করতে পারোনি।

তাফসীরে ইবনে কাসীর : ৩য় খন্ড, আল বাজ ১৮৭২

মায়ের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়ার মানে হলো, তার সঙ্গে উত্তম ব্যবহার করা, তাকে সম্মান করা, তার সামনে বিনয়ী হওয়া, আল্লাহর হুকুমের বরখেলাফ হওয়া ছাড়া তিনি যা বলবেন তা পুরোপুরি তামিল করা, সবসময় মাকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করা। এমনকি যুদ্ধে যেতে হলেও মায়ের অনুমতি নেয়ার বিধান জারি করেছে ইসলাম।

আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস রদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে আগমন করল এবং বলল, আমি আপনার কাছে হিজরত ও আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের বাইআত হতে এসেছি। তিনি জানতে চাইলেন, তার পিতামাতা বেঁচে আছে কিনা। লোকটি উত্তর করল, হ্যাঁ উভয়েই বেঁচে আছেন। রসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন, তোমার পিতামাতার কাছে ফিরে যাও এবং তাদের সেবা করো। বুখারি ও মুসলিম

ইসলামের আগমনের পূর্বে যেসব ধর্মীয় অনুশাসন ছিল, তারা অনেকেই মায়ের সঙ্গে সন্তানের সম্পর্ককে অবহেলার চোখে দেখেছে। মাকেও পর্যাপ্ত সম্মান দিতে শেখায়নি। অথচ ইসলাম শুধু পিতামাতা নয় বরং খালা ও ফুফুদের হকও আদায় করার ওপর জোর দিয়েছে।

> ইবনে উমার রদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে একজন লোক এসে বলল, হে আল্লাহ্র রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমি একটি কবীরা গুনাহ করে ফেলেছি। আমার তাওবা করার সুযোগ আছে কি? তিনি প্রশ্ন করেন, তোমার মা কি বেঁচে আছেন? সে বলল, না। তিনি আবার প্রশ্ন করেন, তোমার খালা কি বেঁচে আছেন? সে বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তার সঙ্গে উত্তম আচরণ করো। কারণ খালা হলো মাতৃস্থানীয়। তা'লীকুর রাগীব ৩ : ২১৮, তিরমিজি ১৯০৫

এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হিসেবে মনে রাখা উচিত, যদি মা মুমিন নাও হয় তবুও ইসলাম তার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করার জন্য আদেশ দিয়েছে।

> একবার আসমা বিনতে আবুবকর রদিয়াল্লাহু আনহু রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এসে জানালেন, আমার মা আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। তিনি এখনো ইসলাম গ্রহণ করেননি। তার সঙ্গেও কি আমি ভালো ব্যবহার করব? রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হ্যাঁ। তুমি তোমার মায়ের সঙ্গে সর্বোত্তম ব্যবহারটুকুই করবে। আল লুলু ওয়াল মারজান ৫৮৭

ইসলাম একজন মায়ের অধিকারের বিষয়ে কতটা সচেতন তা বুঝা যায় একজন তালাকপ্রাপ্তা মায়ের প্রতি ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি যাচাইয়ের মাধ্যমে। যদি কোনো পিতামাতার মধ্যে ছাড়াছাড়িও হয়ে যায় তাহলে সন্তানের উচিৎ পিতার তুলনায় মায়ের অধিকারের বিষয়ে অধিক যত্নবান ও সচেতন হওয়া।

> আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একজন মহিলা সাহাবি রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে প্রশ্ন করলেন, হে রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! এ শিশুটিকে আমি গর্ভে ধারণ করেছি। আমি তাকে দুধ পান করিয়েছি। আমি তাকে রাতের পর রাত কোলে নিয়ে ঘুম পাড়িয়েছি। এখন তার পিতা শিশুটিকে আমার থেকে কেড়ে নিয়েছে। রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বললেন, এটা ঠিক হয়নি। তোমার এ সন্তানের প্রতি তার পিতার তুলনায় বেশি অধিকার আছে যদি তুমি নতুন করে আর কাউকে বিয়ে না করো।
>
> মুসনাদে আহমাদ ৬৭০৭

ইমাম আল খাতাবি রহমাতুল্লাহি আলাইহি তার বিখ্যাত গ্রন্থ মা'লিম আস সুন্নাহতে বলেন, পাত্র হলো সেই জিনিস যা একটি বস্তুকে ধারণ করে। মা হলো

একটি সন্তানের জন্য প্রকৃত ধারক যদিও পিতা ও মাতা মিলে একটি সন্তানকে পৃথিবীতে নিয়ে আসে। তারপরও সন্তান পেটে বহন করা, তাকে জন্ম দেয়া এবং পোষ্য হিসেবে তাকে বড় করার কাজটি মা একাই করে এবং এখানে পিতার তেমন একটা শেয়ার করারও কোনো সুযোগ নেই। তাই সন্তানকে নিয়ে যদি পরবর্তীতে কোনো বিবাদ ও বিতর্কের সূত্রপাত হয় সেখানেও পিতার তুলনায় বরং মায়েরাই বেশি সুবিধা পাবে।

যে মাকে ইসলাম এত বেশি সম্মান দিলো এবং তার দায়িত্ব পালনের সবটুকু সুবিধা নিশ্চিত করল, সেই মায়েরও কিছু দায়িত্ব রয়েছে। প্রথমত তাকে সততা ও একনিষ্ঠতার সঙ্গে বাচ্চাকে প্রতিপালন করতে হবে। তাদেরকে যথাযথভাবে লালন করতে হবে। সন্তানের মধ্যে উত্তম আমল ও উত্তম গুণাবলীর বীজ বপন করতে হবে। একজন মাকেই তার সন্তানকে যথাযথভাবে আল্লাহর আনুগত্য করার শিক্ষা প্রদান করতে হবে।

সন্তানকে উৎসাহিত করতে হবে, যাতে সে সবসময় সত্যের সঙ্গে থাকে এবং সত্যের পক্ষেই অবস্থান নেয়। জাগতিক কোনো মোহ যাতে তাকে আল্লাহর পথে জিহাদের প্রক্রিয়া থেকে দূরে সরিয়ে না নেয়। একজন মায়ের পক্ষে কাজগুলো করা সহজ। কারণ তার অন্তরে আল্লাহ মাতৃত্বের অসাধারণ গুণাবলী প্রদান করেছেন। আর একজন মা সেই গুণাবলীকে কাজে লাগিয়ে সন্তানকে সুপথে রাখতে পারেন।

৫.২ যে মায়েরা অমর হয়ে আছেন

আমরা কাদেসিয়া যুদ্ধের ইতিহাস থেকে আল খানসা নামক একজন মুমিনা মায়ের কথা জানতে পারি। এই মা তাঁর চারটি ছেলেকেই সাহসী ও অবিচল থাকার জন্য অনুপ্রেরণা দিয়ে যাচ্ছিলেন। যুদ্ধশেষে যখন মায়ের কাছে তাঁর চার ছেলেরই শহীদ হওয়ার সংবাদ এল তখন এই মা কিন্তু দুঃখ-শোকে ভেঙ্গে পড়েননি। বিলাপও শুরু করেননি। বরং শান্ত ও সন্তুষ্টচিত্তে তিনি বলেছিলেন, সমস্ত প্রশংসা সেই মহান আল্লাহর, যিনি আমাকে শহীদের মা হওয়ার সম্মান ও মর্যাদা দান করেছেন।

কুরআনে আমরা বেশ কয়েকজন অসাধারণ মায়ের দৃষ্টান্ত পাই, মানব ইতিহাসে যাদের প্রভাব ও গুরুত্ব অপরিসীম। উদাহরণ স্বরূপ, এখানে মূসা আলাইহিস সালাম এর মায়ের কথা বলা যায়। এই মা আল্লাহর ওপর ভরসা করে তার নয়নের মনি সন্তানকে নদীতে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন। আল্লাহ বলেন :

وَاَوْحَيْنَآ اِلٰٓى اُمِّ مُوْسٰٓى اَنْ اَرْضِعِيْهِ ۚ فَاِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَاَلْقِيْهِ فِى

الْيَمِّ وَلَا تَخَافِيْ وَلَا تَحْزَنِيْ ۚ اِنَّا رَآدُّوْهُ اِلَيْكِ وَجَاعِلُوْهُ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ○

আমি মূসার মাকে আদেশ পাঠালাম যে, তাকে বুকের দুধ পান করাতে থাক। এরপর যখন তুমি তার সম্পর্কে বিপদের আশঙ্কা করো, তখন তাকে পানিতে নিক্ষেপ করো এবং ভয় করবে না, দুঃখও করবে না। আমি অবশ্যই তাকে তোমার কাছে ফিরিয়ে দেবো এবং তাকে রসূলগণের একজন করব।

সূরা আল কাসাস ২৮ : ৭

মারইয়াম আলাইহিস সালাম-এর মায়ের কথাও বলা যায়। তিনি তার গর্ভের সন্তানকে আল্লাহর রাহে উৎসর্গ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। সেই সন্তান সব ধরনের শিরক থেকে মুক্ত থাকবে বলেও তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। তিনি আল্লাহর কাছে দুআ করেছিলেন যাতে আল্লাহ তার এই প্রতিশ্রুতিকে কবুল করেন এবং প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের সামর্থ্য দান করেন।

اِذْ قَالَتِ امْرَاَتُ عِمْرٰنَ رَبِّ اِنِّيْ نَذَرْتُ لَكَ مَا فِيْ بَطْنِيْ مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّيْ ۚ اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ○

ইমরানের স্ত্রী যখন বলল, হে আমার রব! আমার গর্ভে যা রয়েছে আমি তাকে আপনার নামে উৎসর্গ করলাম সবার কাছ থেকে মুক্ত রেখে। আমার পক্ষ থেকে আপনি তাকে কবুল করে নিন, নিশ্চয়ই আপনি শ্রবণকারী, সর্বজ্ঞাত।

সূরা আলে ইমরান ৩ : ৩৫

যখন দেখা গেল মেয়ে হয়েছে, তখন ইমরানের স্ত্রী বুঝলেন তিনি যেভাবে প্রতিশ্রুতি করেছিলেন সেভাবে আল্লাহ কবুল করেননি। তারপরও তিনি আল্লাহর কাছে দুআ করলেন, যাতে কন্যা সন্তানটিকে আল্লাহ সব ধরনের অনিষ্ট থেকে হেফাজত করেন।

فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ اِنِّيْ وَضَعْتُهَا اُنْثٰى وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْاُنْثٰى ۚ وَاِنِّيْ سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَاِنِّيْٓ اُعِيْذُهَا بِكَ وَ ذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ○

এরপর যখন তাকে প্রসব করল বলল, হে আমার রব! আমি এক কন্যা প্রসব করেছি। বস্তুতঃ সে কি প্রসব করেছে আল্লাহ তা ভালোই জানেন। সেই কন্যার

মতো কোনো পুত্রই যে নেই। আমি তার নাম রাখলাম মারইয়াম। আর আমি তাকে ও তার সন্তানদেরকে তোমার আশ্রয়ে সমর্পণ করছি। অভিশপ্ত শয়তানের কবল থেকে। সূরা আলে ইমরান ৩ : ৩৬

শুধু তাই নয়, কুরআনে জানা যায়, ইমরানের মেয়ে ঈসা আলাইহিস সালাম-এর মা এবং মারইয়াম আলাইহিস সালামকে আল্লাহ বিশুদ্ধতা, পবিত্রতা, বিনম্রতা আর ঈমানের জলজ্যান্ত প্রতীক হিসেবে স্থাপন করেছেন। আল্লাহ বলেন :

وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرٰنَ الَّتِيْٓ اَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيْهِ مِنْ رُّوْحِنَا
وَصَدَّقَتْ بِكَلِمٰتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهٖ وَكَانَتْ مِنَ الْقٰنِتِيْنَ ۝

আর দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন ইমরান তনয়া মারইয়ামের, যে তার সতীত্ব বজায় রেখেছিল। এরপর আমি তার মধ্যে আমার পক্ষ থেকে রূহ্ ফুঁকে দিয়েছিলাম এবং সে তার রবের বাণী ও কিতাবকে সত্যে পরিণত করেছিল। সে ছিল বিনয় প্রকাশকারীণীদের একজন। সূরা আত তাহরিম ৬৬ : ১২

৬

নারী যখন কন্যা

ইসলামপূর্ব জমানায় কন্যাশিশুর জন্মে আরব নাগরিকরা কষ্ট পেত, বিব্রত ও বিরক্ত হতো। কোনো একজন পিতা যখন জানত যে, তার স্ত্রী কন্যা সন্তানের জন্ম দিয়েছে, তখন সে খুবই নেতিবাচক মন্তব্য করত। অনেক সময়ই বলত, হায়! কন্যা সন্তান হলো। সে তো কখনোই ছেলে সন্তানের মত উপকারী হবে না। সে কখনোই নিজের পিতাকে এবং পরিবারকে সুরক্ষা দিতে পারবে না। চিৎকার করা আর কান্না করা ছাড়া মেয়েরা কোনো কাজেই আসে না। সে কখনোই গোত্রের বা বংশের সম্মান রক্ষায় অস্ত্র হাতে তুলে নিতে পারবে না। যুদ্ধ করতে পারবে না। সে কখনোই পরিবারের যত্ন নিতে পারবে না। যদি তার স্বামী তাকে দয়া করে কিছু দেয় তাহলেই সে পরিবারের জন্য কিছু করতে পারবে।

আরবে সেই সময়ে এমন বাস্তবতাও ছিল যে, অভাবের তাড়নায় বা সম্ভাব্য অভাবের আশঙ্কায় অথবা অপমানিত হওয়ার আশঙ্কায় অনেক পিতাই তাদের মেয়েকে জীবন্ত দাফন দিয়ে দিত। আল কুরআন এসব অপসংস্কৃতিকে প্রত্যাখান করে নারীর সম্মান প্রতিষ্ঠা করেছে। আল্লাহ বলেন :

وَإِذَا الْمَوْءُدَةُ سُئِلَتْ - بِأَيِّ ذَنْۢبٍ قُتِلَتْ ○

যখন জীবন্ত দাফন করে দেয়া কন্যাকে জিজ্ঞেস করা হবে, কি অপরাধে তাকে হত্যা করা হলো? সূরা আত-তাকভীর ৮১ : ৮-৯

তৎকালে কন্যা সন্তান জন্ম নেয়ার পর পিতার যে অবস্থা হতো, কুরআন সেই বিষয়টিও তুলে ধরেছে এভাবে :

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَّهُوَ كَظِيمٌ - يَتَوَارَىٰ
مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوْٓءِ مَا بُشِّرَ بِهٖ ؕ أَيُمْسِكُهٗ عَلٰى هُوْنٍ أَمْ يَدُسُّهٗ فِي
التُّرَابِ ؕ أَلَا سَآءَ مَا يَحْكُمُوْنَ○

যখন তাদের কাউকে কন্যা সন্তানের সুসংবাদ দেয়া হয়, তখন তাদের মুখ কালো হয়ে যায় এবং অসহ্য মনস্তাপে জর্জরিত হতে থাকে। তাকে শুনানো সুসংবাদের দুঃখে সে লোকদের কাছ থেকে মুখ লুকিয়ে থাকে। সে ভাবে যে, অপমান সহ্য করে তাকে থাকতে দেবে না, তাকে মাটির নীচে পুঁতে ফেলবে। শুনে রাখ, তাদের ফয়সালা খুবই নিকৃষ্ট। সূরা আন নাহল ১৬ : ৫৮-৫৯

কিছু কিছু সনাতন আইনে পিতাকে তার কন্যা সন্তানকে মর্জিমত বিক্রি করে দেয়ার সুযোগও দেয়া হয়েছে। আবার কোনো কোনো আইনে পিতাকে এমন সুযোগ দেয়া হয়েছে যে, তিনি তার মেয়েকে যে কারও হাতেই তুলে দিতে পারেন। আর তুলে দেয়ার পর সেই কন্যা সন্তান লোকটির জিম্মায় চলে যায়। লোকটি মেয়েটিকে হত্যাও করতে পারে আবার নিজের কাছেও রাখতে পারে।

কিন্তু ইসলাম আবির্ভূত হওয়ার পর কন্যা সন্তানকে পুত্র সন্তানের মতোই আল্লাহর নেয়ামত হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়। আল্লাহই হলেন একমাত্র ক্ষমতাবান সত্ত্বা। তিনি যাকে ইচ্ছা পুত্র সন্তান দেন, আর যাকে ইচ্ছা নারী সন্তান দান করেন। আল্লাহ্ বলেন :

لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ۗ يَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ اِنَاثًا
وَّيَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ الذُّكُوْرَ - اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَّاِنَاثًا ۚ وَيَجْعَلُ مَنْ
يَّشَآءُ عَقِيْمًا ۗ اِنَّهٗ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ ○

নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের রাজত্ব আল্লাহরই। তিনি যা ইচ্ছা, সৃষ্টি করেন, যাকে ইচ্ছা কন্যা সন্তান এবং যাকে ইচ্ছা পুত্র সন্তান দান করেন। অথবা তাদেরকে দান করেন পুত্র ও কন্যা উভয়ই এবং যাকে ইচ্ছা বন্ধ্যা করে দেন। অবশ্যই তিনি সর্বজ্ঞ, ক্ষমতাশীল। সূরা আশ শুরা ৪২ : ৪৯-৫০

পবিত্র কুরআনে দৃষ্টান্ত সহকারে বর্ণনা করা হয়েছে যে, কীভাবে কিছু কিছু কন্যা সন্তান তাদের অসামান্য আমল ও অবদানের কারণে অনেক পুরুষ থেকেও বেশি প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছেন। তারা মানুষের মনে আজও অমর হয়ে আছেন যেখানে অসংখ্য পুরুষ আবার স্মৃতির আড়ালে চলে গেছে। এক্ষেত্রে আমরা ইমরানের কন্যা মারইয়াম আলাইহিস সালাম-এর কথা বলতে পারি। আল্লাহ্ তাকে অসংখ্য নারীর মধ্য থেকে বাছাই করেছিলেন এবং তাকে বিশুদ্ধ ও পবিত্র করেছিলেন। তার মা আশা করেছিলেন যে, তাঁর একটি সন্তান হবে যিনি বেশি করে আল্লাহর ইবাদত করবে, অনেক বেশি সৎকর্মপরায়ণ হবে। কিন্তু আল্লাহর পরিকল্পনা ছিল ভিন্ন। আল্লাহ্ বলেন :

اِذْ قَالَتِ امْرَاَتُ عِمْرٰنَ رَبِّ اِنِّیْ نَذَرْتُ لَكَ مَا فِیْ بَطْنِیْ مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ
مِنِّیْ ۚ اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ - فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ اِنِّیْ وَضَعْتُهَاۤ
اُنْثٰى ۗ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ ۗ وَلَیْسَ الذَّكَرُ كَالْاُنْثٰى ۚ وَاِنِّیْ سَمَّیْتُهَا مَرْیَمَ

وَإِنِّيٓ أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ - فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُوْلٍ حَسَنٍ وَّأَنْۢبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا ۙ○

ইমরানের স্ত্রী যখন বলল, হে আমার রব! আমার গর্ভে যা রয়েছে আমি তাকে আপনার নামে উৎসর্গ করলাম সবার কাছ থেকে মুক্ত রেখে। আমার পক্ষ থেকে তাকে কবুল করে নিন, নিশ্চয়ই আপনি শ্রবণকারী, সর্বজ্ঞাত। এরপর যখন তাকে প্রসব করল, বলল : হে আমার রব! আমি কন্যা সন্তান প্রসব করেছি। বস্তুতঃ সে কি প্রসব করেছে আল্লাহ তা ভালোই জানেন। ওই কন্যার মতো কোনো পুত্রই যে নেই। আর আমি তার নাম রাখলাম মারইয়াম। আর আমি তাকে ও তার সন্তানদেরকে অভিশপ্ত শয়তানের কবল থেকে আপনার আশ্রয়ে সমর্পণ করছি । এরপর তাঁর রব তাকে উত্তমভাবে গ্রহণ করে নিলেন এবং তাকে প্রবৃদ্ধি দান করলেন, অত্যন্ত সুন্দর প্রবৃদ্ধি। সূরা আলে ইমরান ৩ : ৩৫-৩৭

যেসব মানুষ পুত্র বা কন্যা সন্তানদেরকে হত্যা করে, আল কুরআন তাদের বিরুদ্ধে স্পষ্ট অবস্থান গ্রহণ করেছে। আল্লাহ বলেন :

قَدْ خَسِرَ الَّذِيْنَ قَتَلُوْٓا اَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّ حَرَّمُوْا مَا رَزَقَهُمُ اللّٰهُ افْتِرَآءً عَلَى اللّٰهِ ۗ قَدْ ضَلُّوْا وَ مَا كَانُوْا مُهْتَدِيْنَ ○

নিশ্চয় তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, যারা নিজ সন্তানদেরকে নির্বুদ্ধিতাবশত কোনো প্রমাণ ছাড়াই হত্যা করেছে এবং আল্লাহ তাদেরকে যেসব দিয়েছিলেন, সেগুলোকে আল্লাহর প্রতি ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করে হারাম করে নিয়েছে। নিশ্চিতই তারা পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং তারা হেদায়েত লাভ করেনি।

সূরা আল আনআম ৬ : ১৪০

রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জানিয়েছেন, যেসব পিতারা তাদের কন্যা সন্তানের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করবে, তাদেরকে ধৈর্যের সঙ্গে লালন পালন করবে, তাদেরকে নৈতিক শিক্ষা প্রদান করবে এবং মেয়ে সাবালিকা হওয়া পর্যন্ত এবং নিজের মৃত্যু পর্যন্ত তাদেরকে আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী পরিচালনা করবে, ইসলাম ওই পিতাদের জন্য জান্নাত নির্ধারণ করে দিয়েছে। এরকম পিতারা রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পাশেই জান্নাতে থাকার সুযোগ পাবে বলেও রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জানিয়েছেন।

সহিহ মুসলিমে একটি হাদিস পাওয়া যায় যা আনাস রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে তার দুটো ক্রীতদাস কন্যাকে খাওয়াবে এবং নিরাপত্তা

দেবে, সে আর আমি শেষ বিচারের দিন পাশাপাশি দুই আঙুলের মতোই নিকটবর্তী থাকব। একই রকম বর্ণনা তিরমিজির একটি হাদিসেও পাওয়া যায়। আদাবুল মুফরাদে (৭৭) আরেকটি হাদিস পাওয়া যায়।

> ইবনে আব্বাস রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যে মুসলিমের দুইটি কন্যা সন্তান আছে এবং সে তাদেরকে উত্তম সাহচর্য দান করে তাকে বেহেশতে দাখিল করা হবে।
> ইবনে মাজাহ, মুস্তাদরিকুল হাকিম

বেশ কয়েকটি হাদিস থেকে জানা যায়, যে ভাই তার দুই বোনকে লালন পালন করবে এবং সুরক্ষা দেবে তার জন্যও জান্নাতের নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে। আবার কিছু হাদিসে এমনও জানা যায়, যে ব্যক্তি নারীদের সঙ্গে সদাচরণ করবে, তাকেই আল্লাহ উত্তম প্রতিদান দান করবেন।

> আবু হুরায়রা রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যার তিনটি কন্যাসন্তান থাকবে এবং সে তাদের কষ্ট-যাতনায় ধৈর্য ধরবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। এক ব্যক্তি প্রশ্ন করল, হে আল্লাহর রসূল! যদি দুজন হয়? উত্তরে তিনি বললেন, দুজন হলেও। লোকটি আবার প্রশ্ন করল, যদি একজন হয় হে আল্লাহর রসূল? তিনি বললেন, একজন হলেও। বায়হাকি, শুয়াবুল ঈমান ৮৩১১

> ইবনে আব্বাস রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, কারও যদি কোনো কন্যা সন্তান থাকে, সে যদি তাকে দাফন না করে, কোনোভাবেই অপমান না করে এবং যদি ছেলে সন্তানকে তার মেয়ে সন্তানের চেয়ে বেশি অগ্রাধিকার না দেয়, তাহলে আল্লাহ তাকে জান্নাত দান করবেন। আবু দাউদ ৫ : ৫১৪৬

> আয়িশা রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক মহিলা দুটি শিশুকন্যা সঙ্গে করে আমার কাছে এসে কিছু চাইল। আমার কাছে একটি খেজুর ছাড়া আর কিছু ছিল না। আমি তাকে তা দিলাম। সে নিজে না খেয়ে খেজুরটি দুভাগ করে কন্যা দুটিকে দিয়ে দিল। এরপর মহিলাটি বেরিয়ে চলে গেলে নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের কাছে আসলেন। তাঁর কাছে ঘটনা বর্ণনা করা হলে তিনি বললেন, যাকে এ ধরনের কন্যা সন্তানের ব্যাপারে কোন ধরণের পরীক্ষা করা হয় ওই কন্যা সন্তান তার জন্য জাহান্নামের আগুন থেকে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াবে। বুখারী ২৪ : ১৪১৮, মুসলিম ৪৬ : ২৬২৯

এসব হাদিস ও কুরআনের বাণী চলে আসার পর এ বার্তা সবাই পায় যে, কন্যাশিশুর জন্ম কারো জন্যই কোনো ভীতিকর বোঝা নয়। এটা কোনো বাজে চিহ্ন বা ইঙ্গিতও নয়। বরং কন্যাশিশু আল্লাহর পক্ষ থেকে নেয়ামত। আমাদের

সবারই এই নেয়ামত পাওয়ার জন্য আকুতি থাকা উচিত কেননা আল্লাহ এই নেয়ামতের সঙ্গে অনেক বেশি পুরস্কার অর্জনেরও পথ খুলে দিয়েছেন।

আর এভাবেই নারীদের জীবন্ত দাফনের পথটিকে রুদ্ধ করে দেয়া হয়। কারণ প্রতিটি পিতার মনেই তার মেয়ের জন্য অনেক বেশি আদর ও স্নেহ সঞ্চিত থাকে। এই বাস্তবতার উপলব্ধি ঘটে রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বর্ণনা থেকেও, কেননা, তিনি নিজের মেয়ে ফাতিমা রদিয়াল্লাহু আনহার জন্য এমনটা বলেছিলেন।

> মিসওয়ার ইবনে মাখরামা রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, ফাতিমা আমার টুকরো। যে ফাতিমাকে রাগিয়ে দেবে, সে আমাকেও ক্রুদ্ধ করবে। বুখারি
>
> আরেকটি হাদিসও পাওয়া যায়। রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, ফাতিমা আমার অংশ। যে তাকে খুশি রাখবে, আমিও তার ব্যাপারে খুশি থাকব আর যে তাকে কষ্ট দেবে, সে যেন আমাকেই কষ্ট দিলো। সে যাতে ভয় পায় আমিও তাতে ভয় পাই। সে যেভাবে অনিষ্ট হয়, তা আমাকেও একইভাবে স্পর্শ করে। আহমাদ ৪ : ৩২৩

কন্যার প্রতি পিতার নিয়ন্ত্রণ বা দায়িত্বও অনেক। একজন কন্যা সন্তান ততটুকু নৈতিক শিক্ষা পাওয়ার হকদার যতটুকু তার ভাই পায়। একটি ছেলের মতোই একটি মেয়েকেও ৭ বছর বয়স থেকে সলাত পড়ার তাগিদ দেয়া হয়েছে। যদি ১০ বছর বয়সে গিয়ে কেউ সলাত না পড়ে তাহলে তাকে শাসন করার কথা বলা হয়েছে।

কন্যারা সাবালিকা হওয়ার আগেই তাদের বিছানা আর তার ভাইদের বিছানা আলাদা করে দেয়ার বিধান দেয়া হয়েছে। তখন থেকেই একটি কন্যা সন্তানকে ইসলামের বিধি-বিধান অনুযায়ী পোশাক পরিধান করতে হবে, সাজ-সজ্জা করতে হবে, বাইরে বের হলে কিংবা কারো সঙ্গে কথা বললেও ইসলামের দিক নির্দেশনা অনুসরণ করতে হবে। বিয়ের আগ পর্যন্ত ইসলাম একজন নারীর ওপর যেসব আমলকে বাধ্যতামূলক বলে নির্ধারণ করে তার সবটুকুই বাস্তবায়ন করতে হবে।

কোনো পিতা তার মেয়েকে বিক্রি করতে পারবে না অথবা মেয়েকে জোর করে অন্য কারো সম্পদ হিসেবে প্রদান করতে পারবে না। ইসলাম নারী ও পুরুষ সকলের বেচাকেনাকেই নিষিদ্ধ করেছে। যদি কোনো মানুষ অপরের দাসী হিসেবে থাকা কোনো নারীকে কিনে নেয় বা মালিকানা সূত্রে পায় তাহলে

অবিলম্বে সেই ক্রীতদাসী নারীকে মুক্ত করে দেয়ার জন্য ইসলাম নির্দেশনা প্রদান করেছে।

যদি কোনো কন্যাসন্তানের নিজস্ব নগদ অর্থ বা সম্পদ থাকে, পিতাকে সেই অর্থ তার জিম্মায় রাখার সুযোগ দিতে হবে। কোনো পিতা অন্য কারো মেয়েকে বিয়ে করার লোভে নিজের মেয়েকে তার সঙ্গে বিয়ে দিতে পারবে না। দেনমোহর ছাড়া কোনো বিয়ে হবে না। আর এ বিষয়ে পিতার কোনো সিদ্ধান্ত দেয়ারও এখতিয়ার নেই। কেননা, দেনমোহর বিষয়টাই মেয়ের অধিকার।

কোনো মেয়ে যদি কোনো পুরুষকে ঘৃণা করে বা একদমই অপছন্দ করে, তাহলে কোনো পিতা সেই মেয়েকে জোর করে ওই মানুষের সঙ্গে বিয়ে দিতে পারবে না। একজন মেয়েকে বিয়ে দেয়ার ক্ষেত্রে তার মতামতকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। বিবাহিত মেয়ের ক্ষেত্রে তার বিয়ের অনুমতিটি পরিষ্কার কণ্ঠে শুনা জরুরি। আর যে কুমারি, সে যদি লজ্জার কারণে কথা বলতে না পারে, তাহলে তার নীরবতাকে সম্মতির লক্ষণ হিসেবে বিবেচনা করা যাবে।

যদি কোনো মেয়ে বিয়ের প্রস্তাব দেয়ার পর 'না' বলে তাহলে কোনো অবস্থাতেই তার পিতা তাকে সেই বিয়ে করার জন্য চাপ দিতে পারবে না। অর্থাৎ মেয়ের অসম্মতিতে একজন পিতা কোনোভাবেই বিয়ের আয়োজন করতে পারেন না।

> আবু সালামা রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কোনো বিধবা নারীকে তার সম্মতি ব্যতীত বিয়ে দেয়া যাবে না এবং কুমারী মহিলাকে তার অনুমতি ব্যতীত বিয়ে দিতে পারবে না। লোকেরা জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহ্র রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! কেমন করে তার অনুমতি নেব। তিনি বললেন, তার চুপ করে থাকাটাই তার অনুমতি। বুখারী ৬৭ : ৫১৩৬, মুসলিম ৯ : ১৪১৯

> আয়েশা রদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রসূল! মহিলাদের বিয়ে দিতে তাদের অনুমতি নিতে হবে ? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমি বললাম, কুমারীর কাছে অনুমতি চাওয়া হলে তারা লজ্জাবোধ করে; ফলে চুপ থাকে। তিনি বললেন, নিরবতাই তার অনুমতি।
> বুখারী ৬৯৪৬, মুসলিম ১৪২০

> এ কারণে মুহাদ্দিসরা কুমারী মেয়েদেরকে এই বিষয়টা জানিয়ে দিতে বলেছেন যে, তার নিরবতাও সম্মতি হিসেবে গণ্য হতে পারে। খানসা বিনতে খিযাম রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি কুমারী না হওয়া সত্ত্বেও আমার বাবা জোর করে আমাকে বিয়ে দিয়েছিলেন। আমি তখন বিয়েকে খুবই ঘৃণা করতাম। আমি রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়া সাল্লামের কাছে গিয়ে আমার অসন্তোষের কথা জানালাম। রসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেই বিয়েটি বাতিল করে দিলেন। বুখারী ৬৪৯৮

এ হাদিসগুলো থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, একজন পিতাকে তার মেয়ে বিয়ে দেয়ার আগে তার অনুমতি গ্রহণ করতে হবে। আর মেয়ের সম্মতি এক্ষেত্রে অপরিহার্য। প্রতিটি কুমারী ও তালাকপ্রাপ্তা মেয়ের কাছেই অনুমতি চাইতে হবে। আর তাদের অনুমতি ছাড়া বিয়ে হওয়া সম্ভব নয়।

আয়েশা রদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক তরুণী এসে তাঁকে বললেন, আমার পিতা আমাকে তার ভাতিজার নিকট বিবাহ দিয়েছে আমাকে দিয়ে তার নীচুতা দূর করে মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য কিন্তু আমি তা অপছন্দ করি। তিনি বললেন, তুমি রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আগমন পর্যন্ত এখানে বসো। পরে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আগমন করলে তিনি তাঁকে বিষয়টি অবহিত করলেন। তিনি তার পিতার কাছে লোক পাঠিয়ে তাকে ডেকে আনলেন এবং ঐ তরুণীর সম্মতির উপর বিষয়টি ছেড়ে দিলেন। তরুণী বললেন, ইয়া রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমার পিতা যা করেছেন, তাতে আমি সম্মতি দিলাম। নারীদের এ বিষয়ে কোনো অধিকার আছে কিনা তা জানাই ছিল আমার ইচ্ছা। সুনানে নাসাঈ ৩২৬৯

রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উপর্যুক্ত হাদিস থেকে প্রমাণিত যে, কন্যা কুমারী হোক অথবা তার আগে কোথাও বিয়ে হোক না কেন, নতুন করে বিয়ের ক্ষেত্রে তাদের অনুমতি গ্রহণ করাটা বিয়ের চুক্তিরই একটি অংশ। যদি কোনো তালাকপ্রাপ্তা বা বিধবা মেয়ের বাবা তার মেয়েকে অনুমতি ছাড়াই বিয়ে দেয়, তাহলে নিকাহনামাটি অকার্যকর হয়ে পড়বে। খানসা বিনতে খিযাম রদিয়াল্লাহু আনহার ঘটনাতেও তাই প্রমাণ হয়। আর মেয়ে যদি কুমারী হয় তাহলে তাদেরকে পাত্র বাছাই করার সুযোগ দিতেই হবে। সে চাইলে বিয়ে হবে, না চাইলে বিয়ে বাতিল হয়ে যাবে।

শুধু পাত্রীর নিজের অনুমতি নয়, যে মা একটি কন্যা সন্তানকে জন্ম দিয়েছেন সেই কন্যার বিয়ে দেয়ার ক্ষেত্রে মায়ের মতামতটিকেও ইসলাম অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করেছে।

ইবনে উমার রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মায়েদের থেকে তাদের কন্যাদের ব্যাপারে পরামর্শ নাও। আবু দাউদ ২০৯৫

এ হাদিসের ওপর মন্তব্য করতে গিয়ে ইমাম আবু সুলাইমান আল কাত্তাবি

রহমাতুল্লাহি আলাইহি মূল্যবান কিছু কথা বলেছেন। এ মন্তব্যটি পাওয়া যাবে তার বিখ্যাত গ্রন্থ 'মা'লিম আস সুন্নাহ'য়। এ বইতে তিনি বেশ কিছু ক্ষেত্রে নৈতিকতার বিষয়টিকেও পরিস্কার করেছেন। যেমন, মায়ের অনুমতি নেয়া প্রসঙ্গে তিনি বলেন, কন্যার বিয়ের ক্ষেত্রে মায়ের মতামত জরুরি। শুধু এ জন্যই মেয়ের বিয়ের সময় মায়ের সঙ্গে পরামর্শ করতে হবে এমন নয়। এ পরামর্শটি এ জন্যেও করতে হবে যে, মেয়েরা এ পরামর্শে অনেকখানি নিরাপদবোধ করে। অনেকক্ষেত্রেই মায়েদের সঙ্গে মেয়েদের একটি ঘনিষ্ট ও আত্মিক সম্পর্ক থাকে। তাছাড়া সাংসারিক জীবনের মেয়ের সঙ্গে তার স্বামীর সম্পর্ক সুন্দর রাখার ক্ষেত্রে এবং তাদের পরস্পরকে পরস্পরের কাছে যাওয়ার ক্ষেত্রে মায়েরা ভুমিকা পালন করে থাকেন।

৬.১ ইবনে কুদামা রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর মতামত

ইবনে কুদামা রহমাতুল্লাহি আলাইহি ছিলেন একজন প্রখ্যাত ফকীহ, ধর্মতত্ত্ব বিশেষজ্ঞ এবং সুফী। তিনি ১১৪৭ সালে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ১২২৩ সালে ইন্তেকাল করেন। ইসলাম ও শরীয়াতের বিষয়ে তার অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। বিয়ে বিষয়ে তার মতামত হলো :

> যদি কোনো শাসক একটি বিয়ের চুক্তি সম্পাদন করে তাহলে তা আর বাতিল হবে না। এখানে শাসক বা কাজির একটি বিশেষ ক্ষমতা আছে। তারা যদি কোনো বিয়ে দায়িত্ব নিয়ে সম্পাদন করেন তাহলে তা কেবল তখনই বাতিল বলে গণ্য হবে যদি তা কুরআনের আয়াতের বা রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হাদিসের বিপক্ষে চলে যায়। শাসকেরা এক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাবেন। কেননা, বিয়ে হলো দুই পক্ষের মধ্যে আপোষের মাধ্যমে সংঘটিত একটি সামাজিক ও ধর্মীয় বিধান। তাই তিনি যখন সব পক্ষকে বিবেচনায় নিয়ে একটি বিয়ে সম্পাদন করবেন, তা আর বাতিল করা যাবে না।

হাদিসে 'অভিভাবক ছাড়া বিয়ে নয়' মর্মে যে অবস্থান ঘোষণা করা হয়েছে তাকে বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করার সুযোগও আছে।

এজন্যই ইবনে কুদামাহ রহমাতুল্লাহি আলাইহিকে অনেক বেশি জ্ঞানী ও দূরদর্শী হিসেবে বিবেচনা করা হয়। আল্লাহ তাকে এর উত্তম প্রতিদান দান করুন। আরো কৌশলী হওয়ার জায়গা থেকে বলা যায়, বিয়েটা এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে আস্থায় নিয়েই করতে হবে। এখানে মা, পিতা এবং মেয়ে সবার অংশগ্রহণ থাকবে। যাতে কেউ অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে অযাচিত গীবত, পরচর্চা, পরনিন্দা

ও ঝগড়া করতে না পারে। কারণ আল্লাহ্ বিয়ে প্রথাটির সুযোগই দিয়েছেন সমাজে ভালোবাসা ও করুণার সম্প্রসারণ ঘটানোর জন্য।

একজন পিতার দায়িত্ব হলো তার মেয়ের জন্য সঠিক ও যোগ্য ব্যক্তিকে পাত্র হিসেবে বাছাই করা যে তার মেয়েকে সুখে রাখতে পারবে এবং মেয়েও যার সান্নিধ্যে ভালো থাকবে। এক্ষেত্রে কন্যার পিতাকে ছেলের নৈতিকতা ও ঈমানকে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে। জাগতিক অর্জন এবং পার্থিব বিষয়াবলীকে অগ্রাধিকার দেয়ার সুযোগ নেই। অন্যদিকে, যদি কোনো যোগ্য ব্যক্তি তার মেয়েকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়, তাহলেও একজন পিতা অযাচিতভাবে সেখানে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারবে না।

> আবু হুরায়রা রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমাদের নিকট এমন কোনো ব্যক্তি বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে এলে যদি তার চরিত্র ও ধর্মানুরাগ সম্পর্কে তোমরা সন্তুষ্ট, তাহলে তার সঙ্গে (তোমাদের মেয়েদের) বিয়ে দাও। তোমরা যদি তা না করো, তাহলে পৃথিবীতে বিপর্যয় ও ব্যাপক বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়বে। ইবনে মাজাহ ১৯৬৭

এভাবেই ইসলাম একজন পিতাকে এ শিক্ষা দিচ্ছে যে, সব কিছুর আগে তার মেয়ে একজন মানুষ। সে কোনো পণ্য নয় যাকে বেশি টাকা বা সুযোগ সুবিধা পেলেই অন্য কারো হাতে তুলে দেয়া যাবে। যদিও কিছু সংখ্যক অজ্ঞ ও লোভী পিতামাতাকে আজকের সময়ে এসেও এ ধরনের কাজ করতে দেখা যায়।

> অথচ হাদিসে এসেছে, একজন নারীর জন্য এটা পরম সৌভাগ্যের যদি সে তার বিয়ে, তার দেনমোহর, তার সন্তান ধারণ এবং সন্তান প্রসব করার মতো কাজগুলোতে ভূমিকা পালন করতে পারে। মুসনাদে আহমাদ ৬ : ৭৭

৭

নারী যখন স্ত্রী

প্রাচীন বেশ কিছু বিশ্বাসে নারীদেরকে অপবিত্র হিসেবে গণ্য করা হয়। বলা হয়, শয়তানই নারীদেরকে সৃষ্টি করেছে। এ কারণে এসব চিন্তায় বিশ্বাসীরা নারীদের থেকে দূরে থাকার উদ্দেশ্যে সংসার জীবন ত্যাগ করে এক ধরনের বৈরাগ্য জীবনকেই বেছে নেয়। আবার কিছু কিছু ধর্মবিশ্বাসে স্ত্রীদেরকে পুরুষদের দৈহিক মনোরঞ্জনের বস্তু হিসেবেই উপস্থাপন করা হয়। তাদের মতে, নারী তথা স্ত্রীরা ঘরে থাকবে, বাসার সবার জন্য খাবার রান্না করবে, শুধু এটুকুই।

কিন্তু ইসলাম এই সকল চিন্তাধারাকেই প্রত্যাখান করে। দুনিয়াকে ত্যাগ করে বৈরাগির জীবন বেছে নেয়ার জন্য ইসলাম উৎসাহ দেয় না। ইসলাম বিয়েকে এবং নারী ও পুরুষের সহাবস্থানকে এই মহাবিশ্ব পরিচালনায় আল্লাহ্ তাআলার অন্যতম নিদর্শন হিসেবে বিবেচনা করে। আল্লাহ বলেন :

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ○

> আর এক নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদের জন্যে তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের সঙ্গীনীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তিতে থাক এবং তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয়ই এতে চিন্তাশীল লোকদের জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে।
>
> সূরা আর রূম ৩০ : ২১

যখন বেশ কয়েকজন সাহাবী নিজেদেরকে জাগতিক কর্মকাণ্ড থেকে গুটিয়ে নিয়ে শুধুমাত্র আল্লাহর ইবাদতেই নিয়োজিত হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করল, যখন তারা সারাদিন সওম পালন আর রাতে মহিলাদের থেকে বিচ্ছিন্ন থেকে শুধুমাত্র সলাতে মশগুল থাকার প্রস্তাব দিলো, তখন রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেই প্রস্তাবকে প্রত্যাখান করলেন। হাদিসটি এরকম :

> আনাস ইবনে মালিক রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিন জনের একটি দল নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ইবাদত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার জন্য নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর স্ত্রীগণের গৃহে আগমন করল। যখন তাদেরকে এ সম্পর্কে অবহিত করা হলো, তখন তারা ইবাদতের পরিমাণ যেন কম মনে করল এবং বলল, আমরা নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সমকক্ষ হতে পারি না। কারণ, তাঁর আগের ও

পরের সকল গুনাহ্ মাফ করে দেয়া হয়েছে। এমন সময় তাদের মধ্য থেকে একজন বলল, আমি সারা জীবন রাতের সলাত আদায় করতে থাকব। অপর একজন বলল, আমি সারা বছর সিয়াম পালন করব এবং কখনও বিরতি দিব না। অপরজন বলল, আমি নারী বিবর্জিত থাকব, কখনও বিয়ে করব না। এরপর রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের কাছে এলেন এবং বললেন, তোমরা কি ঐ সকল ব্যক্তি যারা এরূপ কথাবার্তা বলেছ? আল্লাহ্র কসম! আমি আল্লাহকে তোমাদের চেয়ে বেশি ভয় করি এবং তোমাদের চেয়ে তাঁর প্রতি আমি অধিক আনুগত্যশীল। অথচ আমি সিয়াম পালন করি, আবার সিয়াম থেকে বিরতও থাকি। সলাত আদায় করি এবং ঘুমাই ও বিয়ে করি। সুতরাং যারা আমার সুন্নাতের প্রতি বিরাগভাব পোষণ করবে, তারা আমার দলভুক্ত নয়। বুখারী ৫০৬৩, মুসলিম ১৪০১

ইসলাম বলছে, একজন স্ত্রী যদি উত্তম হন তাহলে তিনি তার মুমিন স্বামীর জন্য সবচেয়ে উত্তম সম্পদেও পরিণত হতে পারেন। একজন ভালো জীবনসঙ্গিনী মূলত ব্যক্তির জীবনে সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য নিয়ে আসে।

ইবনে আব্বাস রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমি কি তোমাকে মানুষের সর্বোত্তম সম্পদ সম্পর্কে অবহিত করব না? তা হলো, সৎকর্মপরায়ণ স্ত্রী। স্বামী তার দিকে তাকালে সে তাকে আনন্দ দেয় এবং তাকে কোনো নির্দেশ দিলে সে তা মেনে নেয় এবং স্বামী যখন তার থেকে অনুপস্থিত থাকে, তখন সে তার সতীত্ব ও তার সম্পদের হিফাজত করে। আবু দাউদ ১৬৬৪

আবদুল্লাহ ইবনে আমর রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্নিত। রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, পৃথিবীটা স্বস্তির জায়গায় পরিণত হয় যদি ভালো একজন নারীকে একজন ব্যক্তি উৎকৃষ্ট সম্পদ হিসেবে তার জীবনে পেয়ে যায়। মুসলিম ১৪৬৭

রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেন, যে ব্যক্তি স্ত্রী হিসেবে একজন উত্তম নারীকে পেল, সে যেন তার ধর্মকে অর্ধেক পালন করে ফেলল। এরপর সে ব্যক্তি যদি আল্লাহর আনুগত্য জারি রাখে, তাহলে বাকি অর্ধেকও পূরণ হয়ে যায়। মুস্তাদরাকুল হাকিম

অন্য হাদিসে রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তিনটি বিষয় মানুষের জীবনে সুখ নিয়ে আসে। এগুলো হলো উত্তম স্ত্রী, ভালো একটি বাড়ি আর ভালো একটি বাহন। আর তিনটি বিষয় মানুষের জীবনে ভোগান্তি ও কষ্টের সৃষ্টি করে। এগুলো হলো, খারাপ স্ত্রী, খারাপ বাড়ি এবং বাজে বাহন। আহমাদ, আল তাবরানি

অন্য আরেকটি হাদিসে, রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, কোনো মানুষকে যদি চারটি জিনিস দেয়া হয় তাহলে ধরে নেয়া যায় যে, সেই ব্যক্তি দুনিয়াতে ও আখেরাতে সর্বোত্তম কিছুই পেল। এগুলো হলো, কৃতজ্ঞ অন্তর, আল্লাহর জিকিরে ব্যস্ত মুখ (জিহবা), এমন একটি শরীর যা ধৈর্যের সঙ্গে কষ্টকে সহ্য করতে পারে এবং একজন উত্তম স্ত্রী, যিনি তার তার সঙ্গে বা তার সম্পদের সঙ্গে কখনো প্রতারণা করেন না।

আল তাবরানি ১১২৭৫

ইসলাম স্ত্রী হিসেবে নারীর সম্মান, মর্যাদা ও গুরুত্বকে অনেক বেশি বৃদ্ধি করেছে। নারীর বৈবাহিক দায়িত্ব পালনকে জিহাদ হিসেবে গণ্য করেছে।

ইবনে আব্বাস রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, একজন নারী এসে রসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে প্রশ্ন করল, হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহ নারী ও পুরুষ সকলেরই সৃষ্টিকর্তা। আর আপনিও নারী ও পুরুষ সকলের জন্যই আল্লাহর প্রেরিত রসূল। কিন্তু জিহাদের মতো একটি আমলকে শুধুমাত্র পুরুষদের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে। যদি তারা এ কাজটি সফলভাবে করতে পারে তাহলে তারা তাদের প্রতিদান পেয়ে যাবে। যদি তারা শহীদ হয়, তাহলে তারা আখেরাতেও উত্তম পুরস্কার পাবে। আমাদের তো এই সুযোগ নেই। তাহলে আমরা কীভাবে আল্লাহর আনুগত্য করলে সমান প্রতিদান পাব? রসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তর দিলেন, তোমরা তোমাদের স্বামীদের আনুগত্য করো এবং তোমাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করো। যদিও তোমাদের মধ্যে খুব কমই এ কাজটি একনিষ্ঠভাবে করে থাক।

আল তাবরানি, আল হাইসামি আল মাজমা ৪ : ৩০৫

ইসলাম নারীদের প্রতি তার স্বামীর কিছু দায়িত্বও নির্ধারণ করে দিয়েছে। নারীরা শুধু পুতুল হয়ে থাকবে না। ইসলাম নারীদেরকে রক্ষাকারী এবং পর্যবেক্ষকের দায়িত্বও প্রদান করেছে। প্রথমত, মুসলিমদের ঈমান ও তাকওয়া সংরক্ষণের অনেকটুকু দায় মহিলাদের ওপর অর্পণ করা হয়েছে। আর দ্বিতীয়ত, সমাজের বিবেক হয়ে থাকা এবং সচেতনতা অবলম্বন করাও নারীর দায়িত্ব। একইসঙ্গে প্রচলিত আইন ও প্রথার প্রতিও তাদেরকে দায়বদ্ধ থাকতে হবে।

স্ত্রী হিসেবে একজন নারীর প্রথম অধিকার হলো তার দেনমোহর। ইসলাম একজন স্বামীকে দেনমোহর দেয়াটা বাধ্যতামূলক করে দিয়েছে। আর দেনমোহর নির্ধারিতও হতে হবে স্ত্রীর ইচ্ছার আলোকে। আল্লাহ বলেন :

وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا

فَكُلُوْهُ هَنِيْٓـًٔا مَّرِيْٓـًٔا ○

আর তোমরা স্ত্রীদেরকে তাদের মোহর দিয়ে দাও খুশিমনে। তারা যদি খুশী হয়ে তা থেকে অংশ ছেড়ে দেয়, তবে তা তোমরা স্বাচ্ছন্দে ভোগ করো।

সূরা আন নিসা ৪ : ৪

খুশিমনে শব্দটা ব্যবহার করায় বুঝা যায় যে, দেনমোহর হলো স্বামীর পক্ষ থেকে স্ত্রীর জন্য উপহার। এটা কোনো দরকষাকষির বিষয় নয়। আবার স্বামী স্ত্রীর কাছ থেকে নানা ধরনের সুবিধা বা স্বস্তি পায় বলে এটা তার প্রতিদানও নয়। যদিও কিছু মানুষ উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে বিষয়টাকে এভাবেই ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করে। এটাই সত্য যে, ইসলাম ছাড়া আর কোনো সভ্যতায় আমরা স্ত্রী হিসেবে নারীর এতটা সম্মান দেখতে পাই না।

বরং অনেক সভ্যতায় নারীরা পুরুষদেরকে অর্থ দিয়ে যায়। আবার পুরুষরাও নারীদেরকে অর্থ দেয়ার জন্য চাপ দেয়। আর ইসলামে মোহরানা নির্ধারণ কিংবা তাতে কোনো ধরনের ছাড় দেয়ার সুযোগ দেয়া হয়েছে শুধুমাত্র নারীদেরকেই।

স্বামীর কাছে স্ত্রীর দ্বিতীয় অধিকার হলো ভরণপোষণ। একজন স্বামীর দায়িত্ব হলো তার স্ত্রীকে খাদ্য, পোশাক, বাসস্থান এবং সামর্থের আলোকে প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা। এখানে সামর্থের বিষয়টা আনা হয়েছে কেননা, ধনী আর গরিব ভেদে স্বাস্থ্যসেবার বিষয়টি আসলে আলাদাই হয়ে থাকে।

রসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, নারীদের ভরণপোষণের দায়িত্বও তোমাদের ওপর। তোমরা তা স্বাভাবিকভাবে এবং সম্মানের সঙ্গে আদায় করবে। আবু দাউদ ১৯০৫

এখানে সম্মানের সঙ্গে কথাটি দিয়ে বুঝানো হয়েছে, এই দায়িত্বটি পালন করার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের ঈমান ও মর্যাদার বিষয়টিকে বিবেচনায় নিতে হবে। কোনো ধরনের অপব্যয় করা যাবে না। আবার কৃপণতাও করা যাবে না। আল্লাহ বলেন :

لِيُنْفِقْ ذُوْ سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهٖ ؕ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهٗ فَلْيُنْفِقْ مِمَّآ اٰتٰىهُ اللّٰهُ ؕ لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا مَآ اٰتٰىهَا ؕ سَيَجْعَلُ اللّٰهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُّسْرًا ○

সচ্ছল যেন তার সচ্ছলতা অনুযায়ী ব্যয় করে। এবং সে, যার ওপর তার রিযিক সংকীর্ণ করা হয়েছে, সে যেন তা থেকে ব্যয় করে, যা আল্লাহ তাকে দিয়েছেন। আল্লাহ কাউকে দায়িত্ব দেন না, তিনি তাকে যা

দিয়েছেন তা ব্যাতিত। কষ্টের পর অচিরেই আল্লাহ স্বস্তি দিবেন।

সূরা আত তৃলাক ৬৫ : ৭

স্ত্রীর প্রতি স্বামীর তৃতীয় দায়িত্ব হলো সৎভাবে এবং সম্মানের সঙ্গে জীবন যাপন করা। আল্লাহ্ বলেন :

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

নারীদের সঙ্গে সদ্ভাবে জীবনযাপন করো। সূরা নিসা নিসা ৪ : ১৯

এই সদ্ভাব কথাটির মধ্য দিয়ে সামষ্টিক অর্থে অনেকগুলো অধিকারকে বুঝানো হয়েছে। বিশেষত স্বামী ও স্ত্রীর সম্পর্কের মধ্যে যত ধরনের ভালো বিষয় আছে সবগুলোকেই এক্ষেত্রে বুঝানো হয়েছে। যেমন : উত্তম আচরণ, সহনশীল ও নমনীয় দৃষ্টিভঙ্গি, নরম সুরে কথা বলা, হাসিমুখে থাকা, স্বস্তিদায়ক ব্যবহার করা এবং সহজ ও সাবলীল থাকা।

> আবু হুরাইরা রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমাদের মধ্যে ঈমানে পরিপূর্ণ মুসলিম হচ্ছে সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তি। যেসব লোক নিজেদের স্ত্রীদের নিকট উত্তম তারাই তোমাদের মধ্যে অতি উত্তম। তিরমিজি ১১৬২

> আয়েশা রদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমাদের মধ্যে সেই উত্তম যে তার পরিবারের কাছে উত্তম। আমি আমার পরিবারের জন্য উত্তম। ইবনে হিব্বান

রসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সিরাত পর্যালোচনা করলে বারবার যে বিষয়টি সামনে আসে তাহলো তিনি তার আশপাশের মানুষের সঙ্গে কতটা নম্রভাবে এবং মৃদুস্বরে কথা বলতেন। তিনি তার স্ত্রীদের সঙ্গেও উত্তম আচরণ করতেন। বাসাবাড়ির কাজেও তাদেরকে সাহায্য করতেন। তিনি স্ত্রীদের সঙ্গে কত ধরনের মজা করতেন তার উত্তম দৃষ্টান্ত হলো, তিনি উম্মুল মুমিনিন আয়েশা রদিয়াল্লাহু আনহার সঙ্গে একাধিকবার দৌড় প্রতিযোগিতা করেছিলেন। তার মধ্যে একবার আয়েশা রদিয়াল্লাহু আনহা জয়ী হন আর দ্বিতীয়বার রসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ।

> আয়েশা রদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি এক সফরে নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সঙ্গে ছিলেন। তিনি বলেন, আমি তাঁর সঙ্গে দৌড় প্রতিযোগিতা করে তাঁর আগে চলে গেলাম। এরপর আমি মোটা হয়ে যাওয়ার পর তাঁর সঙ্গে আবারো দৌড় প্রতিযোগিতা করলাম, এবার

তিনি আমাকে পিছে ফেলে দিলেন, বিজয়ী হলেন। তিনি বলেন, এই বিজয় সেই বিজয়ের বদলা। আবু দাউদ ২৫৭৮

স্বামীর এসব দায়িত্বের বিপরীতে স্ত্রীর প্রধানতম দায়িত্ব হলো, স্বামীর পুরোপুরি আনুগত্য করা যদি না তিনি আল্লাহর হুকুমের বরখেলাফ করার আদেশ দেন। স্ত্রীর দায়িত্ব হলো স্বামীর অর্থ সম্পদের হেফাজত করা। স্বামীর অনুমতি ছাড়া খরচ না করা আর স্বামীর অনুপস্থিতিতে বাসায় অন্য কোনো পুরুষকে প্রবেশ করতে না দেয়া, এমনকি যদি সে আত্মীয় হয়। তবে স্বামী অনুমতি দিলে ভিন্ন কথা। এসব দায়িত্ব পালন করা কোনো স্ত্রীর জন্যই খুব কঠিন নয়। এগুলো খুব অনুচিত বা অযাচিত দায়িত্বও নয়।

আর এটাও স্বাভাবিক যে, প্রতিটি দায়িত্ব ও অধিকারের বিপরীত প্রতিক্রিয়া হিসেবে কিছু দায়িত্ব পালন করতে হবে। ইসলাম শুধু পুরুষকে যেমন সব দায়িত্ব দেয়নি তেমনি নারীদেরকেও সব দায়িত্ব দিয়ে রাখেনি। বরং তাদের উভয়কেই তাদের মতো করে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন :

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ

আর তাদের (নারীদের) রয়ছে উত্তম (মারুফ) অধিকার যেমন তাদের (পুরুষদের) রয়েছে তাদের (নারীদের) ওপর। আর পুরুষদের রয়েছে তাদের (নারীদের) ওপর বিশেষ দায়িত্ব। সূরা আল বাকারা ২ : ২২৮

এ কারণেই নারীদের যেমন অধিকার রয়েছে তেমনি নানা ধরনের দায়িত্বও রয়েছে।

ইবনে আব্বাস রদিয়াল্লাহু আনহু-এর একটি চমৎকার ঘটনা জানা যায়। তিনি একবার একটি কাঁচের সামনে দাঁড়িয়ে নিজের চেহারা এবং পোশাকটিকে ঠিক করে নিচ্ছিলেন।

তাকে প্রশ্ন করা হলো, আপনি এমনটা কেন করছেন? তিনি বললেন, আমি নিজেকে গুছিয়ে রাখি কারণ আমার স্ত্রীরাও আমার সামনে আসার সময় নিজেদেরকে পরিপাটি করে আসে।

তারপর তিনি কুরআনের উপর্যুক্ত আয়াতটি তেলাওয়াত করেন যেখানে আল্লাহ বলে দিয়েছেন যে, পুরুষের ওপর নারীর যেমন অধিকার রয়েছে তেমনি নারীর ওপরও পুরুষের অধিকার রয়েছে।

এই ঘটনার মধ্য দিয়ে বুঝা যায় সাহাবীরা কুরআনের আয়াতকে নিজেদের জীবনে কীভাবে ধারণ করতেন এবং কীভাবে তারা নিজেদের স্ত্রীকে সম্মান দেয়ার চেষ্টা করতেন।

৭.২ স্ত্রীর স্বাধীনতা

বিয়ে হয়েছে বলে ইসলাম কখনোই কোনো নারীকে তার ব্যক্তিত্ব বিসর্জন দিতে বলে না। কোনো কোনো সংস্কৃতিতে, বিয়ের পর মেয়েদের নামের শেষে স্বামীর নাম সংযুক্ত করার বিধান রয়েছে। ইসলাম তা করার জন্য বলে না। ইসলাম সর্বাত্মকভাবে নারীর স্বতন্ত্র ব্যক্তিসত্তাকে ধারণ করতে চায়। এ কারণেই আমরা উম্মুল মুমিনিনদেরকেও তাদের নিজ নামেই চিনে আসছি।

একইসঙ্গে, নাগরিক হিসেবে একজন নারীর যে মর্যাদা তাও বিয়ের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কোনো সুযোগ নেই। বিবাহিত নারীরা কোনো সামাজিক বা আর্থিক চুক্তি করতে পারবে না, এমনও নয়। বিয়ে হলেও নারীরা বেচাকেনা করতে পারবে। তার মালিকানাধীন সম্পদ ভাড়া দিতে পারবে। সম্পদ কিনতে পারবে। নিজের আওতাধীন অর্থ সম্পদ থেকে দান-সাদাকা করতে পারবে। পশ্চিমা কিছু দেশে এসব অধিকার নারীদেরকে দেয়া হলেও অনেক দেশে এসব অধিকার ও দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে স্ত্রীরা এখনো স্বামীদের ইচ্ছা ও মতামতের হাতে জিম্মি হয়ে আছে।

৮

তালাক

সাম্প্রতিক শতকগুলোতে বিশ্বব্যাপী যে আগ্রাসন ও সম্প্রসারণ ঘটেছে তার পরিণতি হিসেবে নারীদের বিষয়ে ইসলামের দুটো শ্বাশত দৃষ্টিভঙ্গিকে সম্পূর্ণভাবে বিতর্কিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। একটি হলো তালাক আর অপরটি বহুবিবাহ। এই দুটো বিষয়ে ইসলামের বক্তব্যকে বিকৃত করে নানা ধরনের নেতিবাচক প্রচারণাও চালানো হয়েছে। অথচ এই দুটো ইস্যুতে ইসলামের অবস্থান রীতিমতো গর্ব করার মতো।

কিন্তু এটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক যে, মুসলিমরা যখন এই দুটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করে তারাও এগুলোকে সমাজ ও পরিবারের জন্য সমস্যা বলেই মনে করে। শুধু তাই নয়, তারা এমন হীনমন্য আচরণ করে যেন এ দুই ইস্যুতে ইসলামের অবস্থান খুবই বিব্রতকর। তাদের এ জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গির কারণে উল্টো ইসলাম এবং ইসলামের শ্বাশত বিধানগুলো প্রশ্নবিদ্ধ হয়।

বাস্তবতা হলো, ইসলাম আগে স্বামী ও স্ত্রীর এবং দাম্পত্য জীবনের অসংখ্য সমস্যার সমাধান করেছে। পরিবার ও সমাজের সব সঙ্কটগুলোর সমাধান দিয়েছে। এরপর তালাক ও বহুবিবাহের মতো বিষয়ে বিধান জারি করেছে।

সমস্যাটি তৈরি হয়েছে কারণ অন্য ধর্মের অনুসারী তো বটেই, এমনকি মুসলিমরাও এ সংক্রান্ত আল্লাহর বিধানকে সঠিকভাবে বুঝতে পারেনি। কোনো কোনো ক্ষেত্রে বরং অপব্যবহার করেছে। আর যখনি কোনো কিছুর অপব্যবহার হয়, তখন এর বহুবিধ নেতিবাচক পরিণতির জন্ম হয়।

৮.১ কেন ইসলাম তালাকের সুযোগ দিয়েছে

ইসলামে সবসময়ই তালাকের সুযোগ দেয়া হয়েছে বা তালাককে প্রশংসা করা হয়েছে এমন নয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তালাককে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে এমনকি নিষিদ্ধও করা হয়েছে। কেননা তালাকের কারণে পরিবারগুলো ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। আর ইসলাম সবসময়ই পরিবারকে সুরক্ষা করতে চায়, সঠিকভাবে ধরে রাখতে চায়। সুনানে আবু দাউদের একটি হাদিসে এসেছে, আল্লাহর কাছে সবচেয়ে অপছন্দনীয় হালাল কাজ হলো তালাক দেয়া। আল্লাহ বলেন :

فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ ۚ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ

بِهٖ مِنْ اَحَدٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ؕ وَيَتَعَلَّمُوْنَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ ؕ

এরপর তারা তাদের কাছ থেকে এমন যাদু শিখত, যার মাধ্যমে স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে। তারা আল্লাহর আদেশ ছাড়া এগুলো দিয়ে কারও অনিষ্ট করতে পারত না। যা তাদের ক্ষতি করে এবং উপকার করে না, তারা তাই শেখে। সূরা আল বাকারা ২ : ১০২

ইসলামি আইন অনুযায়ী তালাক হলো এক ধরনের ব্যথাময় অপারেশনের মতো। যে মানুষটির জ্ঞান থাকে, তিনি আহত হলে বা আঘাত পেলে ব্যথা অনুভব করবেনই। এমনকি সুঁই ফোটানোর ব্যথাও তিনি টের পাবেন। তারপরও আমরা শরীরের ক্ষতিগ্রস্ত অংশটিকে অপারেশন করে ফেলে দেই, যাতে দেহের বাকি অংশগুলো ঠিক থাকে, সুস্থ থাকে।

ঠিক একইভাবে যদি স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বিবাদ হয় তাহলে তা সমাধান করার জন্য তাদের নিজের এবং আশপাশের মানুষেরও প্রয়োজনে উদ্যোগ নিয়ে তার মিমাংসা করা উচিত। কিন্তু সমাধানের সব উদ্যোগ নেয়ার পরও যদি তাদেরকে এক করা না যায়, তখন তিক্ত ওষুধ হলেও হয়ত তালাকই একমাত্র সমাধান হয়ে দাঁড়ায়। এ কারণে মিমাংসা ও আপোষের সকল পথ রুদ্ধ হওয়ার পরই তালাকের কথা চিন্তা করার সুযোগ আছে। কুরআনে আল্লাহ বলেন :

وَاِنْ يَّتَفَرَّقَا يُغْنِ اللّٰهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهٖ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ وَاسِعًا حَكِيْمًا ○

যদি উভয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তবে আল্লাহ নিজস্ব প্রশস্ততা দিয়েই প্রত্যেককে অমুখাপেক্ষী করে দিবেন। আল্লাহ সুপ্রশস্ত, প্রজ্ঞাময়। সূরা আন নিসা ৪ : ১৩০

ইসলাম তালাকের যে বিধানটি দিয়েছে তার নেপথ্যে আছে যুক্তি, প্রজ্ঞা এবং সর্বোপরি মুসলিমদের স্বার্থ। যে দম্পতি পরস্পরকে আর সহ্য করতে পারছে না, পরস্পরের প্রতি যাদের কোনো অনুভূতি কাজ করে না, যাদের নিজেদের মধ্যে কোনো ধরনের আস্থা ও বিশ্বাস আর অবশিষ্ট নেই, সেখানে আইনের দোহাই দিয়ে জোর করে তাদেরকে একসঙ্গে ধরে রাখার চেষ্টা অবান্তর। স্বামী আর স্ত্রী যদি একে অপরকে ঘৃণা করে তাহলে জোর করে তাদেরকে একসঙ্গে বাধ্য করা তাদের উভয়ের জন্যই শাস্তি হয়ে যায়। এই শাস্তি মুক্ত হয়েও কারাবাসের মতো, পৃথিবীতে থেকেও নরকে বাস করার মতো।

এজন্য জ্ঞান সাধক আবু আল তাইয়্যেব আল মুতানাবি বলেন, বেঁচে থাকার একটি বড় সঙ্কট তখনি দেখা যায় যদি আপনাকে এমন কারও সঙ্গে থাকতে হয়, যার সঙ্গে চিন্তাগতভাবে আপনি একমত নন। তার সঙ্গে আপনার মতবিরোধ

ও ঝামেলা লেগেই থাকছে। অথচ এরপরও সে আপনাকে ছেড়ে যাচ্ছে না। প্রকৃতপক্ষেই, একজন মুক্ত মানুষের জন্য পৃথিবী কারাগার হয়ে যায় যখন তাকে কোনো শত্রুর সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে হয় এবং একত্রে সহাবস্থান করতে হয়।

একজন মানুষ যে তার কোনো এক বন্ধু বা সহকর্মীর সঙ্গে দিনে একবার বা সপ্তাহে দু-একবার সাক্ষাত করে বা একসঙ্গে থাকে তাহলে যে স্ত্রীর সঙ্গে সে পুরোটা জীবন পার করে তার বিষয়ে তার কতটা সচেতন থাকা প্রয়োজন তা সহজেই অনুমেয়। অথচ এই সম্পর্কের ক্ষেত্রে বা পদে পদে যদি ফাটল থাকে তাহলে সেই জীবনকে বয়ে নিয়ে যাওয়াও দুঃসাধ্য হয়ে যায়।

৮.২ তালাকের সুযোগ সীমিতকরণ

ইসলাম বেশ কিছু নীতিমালা, শিক্ষা এবং প্রথা প্রতিষ্ঠা করেছে। এগুলোকে যদি সঠিকভাবে অনুসরণ করা হয় এবং একনিষ্ঠতার সঙ্গে প্রয়োগ করা হয় তাহলে আশা করা যায় যে, সমাজে তালাকের প্রয়োজনীয়তা কমে আসবে এবং তালাকের ঘটনাও তাৎপর্যপূর্ণভাবে হ্রাস পাবে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় :

১. স্ত্রী নির্বাচনের বেলায় ভালো পাত্রীকে বাছাই করতে হবে। পাত্রীর অর্থ সম্পদ এবং সৌন্দর্যের তুলনায় তার দীনদারি ও নৈতিকতাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

আবু হুরায়রা রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, চারটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে বিয়ে করা যায়। তার সম্পদ, তার বংশমর্যাদা, তার সৌন্দর্য ও তার দীনদারী। সুতরাং তুমি দীনদারীকেই প্রাধান্য দেবে। অন্যথায় তুমি ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

বুখারী ৫০৯০, মুসলিম ১৪৬৬

২. বিয়ের পূর্বে কনেকে ভালোমতো দেখতে হবে। অন্তত যিনি বিয়ে করবেন তার দেখা উচিত। যাতে সম্ভাব্য পাত্রীর সৌন্দর্য নিয়ে পাত্রের স্পষ্ট ধারণা থাকে। রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও বিয়ের আগে কনে দেখতে বলেছেন।

রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তোমরা কনে দেখতে যাও এবং কনে দেখো। হয়ত এর কারণে তোমাদের মাঝে সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি বৃদ্ধি পাবে।

আল জামি আস সাগির ৮৫৯

যদিও এই দেখাটা বাধ্যতামূলক নয়। তবে রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর এই আদেশের মাধ্যমে বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করা যায়। জাবের রদিয়াল্লাহু আনহু তার নিজের বিয়ের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে

বলেন, আমি লুকিয়ে তাকে দেখতে গিয়েছিলাম। গাছের আড়ালে লুকিয়েই প্রথম তাকে দেখি এবং তাকে বিয়ে করার জন্য উৎসাহিত হই।

দুর্ভাগ্যজনকভাবে, এমন অনেক মুসলিম আছে বিশেষত মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে, যারা বিয়ের আগে মেয়ে দেখাকে অন্যায় বলে মনে করেন। তারা বিয়ের দিনই প্রথম মেয়েকে দেখেন। অথচ এই বিয়ের কন্যাটি হয়ত একজন কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া ছাত্রী, যে কিনা নিয়মিতই ক্লাসে যায়। আবার সে হয়ত অনেক সময়ই মার্কেটে যায়। অনেকেই তাকে দেখার সুযোগ পায়। কিন্তু যার সঙ্গে তার বিয়ে হবে, সেই মানুষটিই তাকে দেখল না।

আবার এর বিপরীতে আরেকটি ধারা দেখা যায়। এরা আবার বর কনেকে একান্তে কথা বলার সুযোগ দেয়, অনেক সময় বাইরে যাওয়ার বা একসঙ্গে বিয়ের আগেই একান্তে কিছু সময় কাটানোরও সুযোগ করে দেয়। দেখা যায়, বিয়ে হয়নি অথচ তারা সিনেমা দেখতে যাচ্ছে, দিব্যি শপিং করে বেড়াচ্ছে। মূলত উপর্যুক্ত দুটি ধারাই চরমপন্থী ও প্রান্তিক মানসিকতা লালন করে। উভয়েই শরীয়ার বিধানকে অতিরঞ্জন করেছে।

৩. যে মেয়ে উন্নত চরিত্রের স্বামী চায় বা যে পরিবার চরিত্রবান কোনো ছেলের কাছে মেয়েকে তুলে দিতে চায় তাদেরকে সবসময় মুমিন ছেলে খুঁজে বের করতে হবে। কেননা হাদিসে এসেছে, যদি তোমাদের সামনে কোনো মুমিন ও নীতিবান ছেলে আসে তাহলে তোমরা তাকে অগ্রাধিকার দাও।

আমাদের পূর্বসূরীরা বলতেন, যখন মেয়েকে বিয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেবে, তখন তাকে মুমিন কোনো মানুষের সঙ্গে বিয়ে দাও। মুমিন মানুষটি তোমার মেয়েকে ভালোবাসলে তার সঙ্গে উৎকৃষ্ট আচরণ করবে। আর কোনো কারণে যদি অপছন্দ করে বা তাদের মধ্যে মনোমালিন্য হয় তাহলেও অন্তত সে কোনো জুলুম করবে না।

৪. বিয়ের ক্ষেত্রে মেয়ের অনুমতি বিয়ের অন্যতম শর্ত। মেয়েকে কখনোই জোর করে তার অপছন্দের কারো সঙ্গে বিয়ে দেয়া যাবে না। একজন মেয়েকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করে বিয়ে দেয়া হয়েছিল। রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেই বিয়েকে বাতিল করে দিয়েছিলেন।

৫. মেয়ের পরিবার বিশেষত মেয়ের অভিভাবকের সন্তুষ্টি ও অনুমোদনকেও বিয়ের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেয়া উচিত। মেয়ে যেন এমন কাউকে বিয়ে না

করে যা তার পরিবার অনুমোদন করেনি। অভিভাবককে অসন্তুষ্ট করে বিয়ে না করাই উত্তম। কেননা এর ফলে মেয়ের সঙ্গে তার পরিবারের দূরত্ব তৈরি হয়ে যেতে পারে। আর এ ধরনের দূরত্ব পরবর্তীতে মেয়ের দাম্পত্য জীবনকেও নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করে।

৬. মেয়ের বিয়ের ক্ষেত্রে মেয়ের মায়ের সঙ্গে পরামর্শ করা জরুরি। তাতে বিয়েটি নিয়েই সকল পক্ষের সন্তুষ্ট থাকার পথ পরিষ্কার হয়। মেয়ের মায়ের মতামতের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে ইতোপূর্বে আমরা হাদিস উল্লেখ করেছি।

৭. যখন দুজন মানুষ একসঙ্গে থাকবেন, এটা খুবই জরুরি যাতে তাদের মধ্যে পারস্পরিক বুঝা পড়া ঠিক থাকে। উভয়েই উভয়ের অধিকারের বিষয়ে সচেতন থাকে এবং নিজেরা নিজেদের কাজগুলোকে সম্মানজনকভাবে নির্ধারণ করে নেয়।

মনে রাখতে হবে, স্বামী ও স্ত্রী উভয়কেই নিজেদের বিবেকের কথা শুনতে হবে। সর্বক্ষেত্রে আল্লাহর আনুগত্য করতে হবে এবং আল্লাহ্ প্রদত্ত বিধানকে অনুসরণ করার চেষ্টা করতে হবে। স্বামী ও স্ত্রীর নিজ নিজ অধিকারের আলোকে আল্লাহ্ দায়িত্ব বন্টন করে দিয়েছেন। আল্লাহ্ বলেন :

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِىْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۖ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۝

আর তাদের (নারীদের) রয়ছে উত্তম (মারুফ) অধিকার যেমন তাদের (পুরুষদের) রয়েছে তাদের (নারীদের) ওপর। আর পুরুষদের রয়েছে তাদের (নারীদের) ওপর বিশেষ দায়িত্ব। সূরা আল বাকারা ২ : ২২৮

৮. স্বামীদেরকে বুঝতে হবে যে, তাদের বাস্তবসম্মত হওয়া উচিত। স্ত্রী একজন মানুষ এবং কোনো মানুষই শতভাগ নিখুঁত নয় এটা মানতে হবে। স্ত্রীর যেমন দুর্বলতা আছে তেমনি তার অনেক ভালো গুণও আছে। সবসময় স্ত্রীর দোষ বা দুর্বলতাকেই বিবেচনায় নেয়া যাবে না। যদি একটি বাজে দোষ চোখে পড়ে তাহলে নিশ্চয়ই তার মধ্যে কোনো না কোনো উত্তম গুণও রয়েছে, যা খুঁজে বের করতে হবে। আল্লাহ্ বলেন :

فَاِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسٰٓى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْـًٔا وَّيَجْعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا ۝

আর যদি তোমরা তাদের অপছন্দ করো তবে এমনও হতে পারে যে, তোমরা এমন কিছু অপছন্দ করছ যার মধ্যে আল্লাহ্ অনেক কল্যাণ রেখেছেন। তোমরা তাদের সাথে সৎভাবে জীবনযাপন করো।

সূরা আন নিসা ৪ : ১৯

৯. স্বামীকে প্রজ্ঞাবান ও বাস্তব সম্মত মানসিকতা লালন করতে হবে। স্ত্রীকে যদি তার অপছন্দ হয় তাহলে তার বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে আশপাশের অন্য যেসব মানুষ এই প্রক্রিয়ায় প্রভাবিত বা ক্ষতিগ্রস্ত হবে, তাদের দিকটাও চিন্তা করতে হবে। আবেগের বশবর্তী হয়ে হুটহাট কিছু করা যাবে না।

১০. স্ত্রী যদি আনুগত্যপরায়ণ নাও হয় তারপরও স্বামীর দায়িত্ব হলো তার সঙ্গে প্রজ্ঞাপূর্ণ আচরণ করা। চিন্তা করে কাজ করতে হবে। দুর্বলতা দেখানো যাবে না। আবার অযাচিত কঠোরতাও নয়। কোনো ধরনের সহিংস আচরণও বাঞ্ছনীয় নয়। আল্লাহ্ বলেন :

وَالّٰتِیْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِی الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّ ۚ فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَیْهِنَّ سَبِیْلًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِیًّا كَبِیْرًا ۝

যাদের মধ্যে অবাধ্যতার আশঙ্কা করো তাদের সদুপদেশ দাও, তাদের শয্যাত্যাগ করো এবং তাতেও কাজ না হলে প্রহার করো। যদি তাতে তারা বাধ্য হয়ে যায়, তবে আর তাদের জন্য অন্য কোনো পথ অনুসন্ধান করবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সবার ওপর শ্রেষ্ঠ। সূরা আন নিসা ৪ : ৩৪

১১. স্বামী ও স্ত্রীর মাঝে ভুল বুঝাবুঝি বা সমস্যা দেখা দিলে কম্যুনিটির বা পরিবারের সিনিয়রদের কাছে সাহায্য চাইতে হবে যাতে তারা মিমাংসা করার উদ্যোগ নেন। পারিবারিকভাবেও কোনো পরামর্শকের কাছে যাওয়া যেতে পারে। আত্মীয়দের মাঝেও যদি আস্থাভাজন কেউ থাকে, তাহলে তার কাছে যেতে হবে যাতে তিনি সংশ্লিষ্ট দম্পতিকে সংশোধন করতে পারেন। তাদের মধ্যে বিদ্যমান সঙ্কটকে সমাধান করে একটি সুন্দর সমাধান প্রণয়ন করতে পারেন। আল্লাহ বলেন :

وَاِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَیْنِهِمَا فَابْعَثُوْا حَكَمًا مِّنْ اَهْلِهٖ وَحَكَمًا مِّنْ اَهْلِهَا ۚ اِنْ یُّرِیْدَاۤ اِصْلَاحًا یُّوَفِّقِ اللّٰهُ بَیْنَهُمَا ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِیْمًا خَبِیْرًا

যদি তাদের মধ্যে সম্পর্কচ্ছেদ হওয়ার মতো পরিস্থিতির আশঙ্কা করো, তবে স্বামীর পরিবার থেকে একজন এবং স্ত্রীর পরিবার থেকে একজন সালিস নিযুক্ত করবে। তারা উভয়ের মিমাংসা চাইলে আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সবকিছু অবহিত। সূরা আন নিসা ৪ : ৩৫

এই হলো ইসলামের কিছু শিক্ষা। যদি মুসলিমরা এগুলোকে সঠিকভাবে অনুসরণ করে এবং মেনে চলে, আশা করা যায় তালাকের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে কমে আসবে ইনশাআল্লাহ।

৮.৩ কখন এবং কীভাবে তালাক সংঘটিত হয়

ইসলাম সবসময় এবং সকল ঘটনার ক্ষেত্রেই তালাকের বিধান প্রয়োগ করতে চায় না। তালাকের মতো বিষয়কে কুরআন ও সুন্নাহ তখনই অনুমোদন দেয়, যখন স্বামী কোনো তাড়াহুড়ো করে না, বরং তার সিদ্ধান্তের জন্য সময় নেয় এবং উপযুক্ত সময়ের জন্য অপেক্ষা করে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, স্ত্রীর মাসিক চলমান, এমন সময়ে স্বামী তাকে তালাক দিতে পারবে না।

আবার যখন স্ত্রীর পিরিয়ড শেষ হয়ে সে পবিত্র হয়ে যাবে তখন যদি তাদের মধ্যে যৌন মিলন হয় তাহলে সে অবস্থায়ও স্বামী তাকে তালাক দিতে পারবে না। সেক্ষেত্রে পরবর্তী পিরিয়ড শেষ হওয়া অবধি স্বামীকে অপেক্ষা করতে হবে। যদি কেউ দিয়ে দেয়, তাহলে সুন্নাহ অনুযায়ী তালাকটি কার্যকর হবে না। কোনো কোনো ইসলামিক স্কলার এমনও বলেছেন, রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা করতে বলেছেন তার বাইরে গিয়ে কিছু হলে আর তালাকটি বৈধ হবে না। কারণ :

> আয়েশা রদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, কেউ যদি এমন কোনো কাজ করে যা রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম করতে বলেননি বরং নিষেধ করেছেন, তাহলে স্বাভাবিক নিয়মেই কাজটি বাতিল হয়ে যায়।
>
> মুসলিম ১৭১৮

একজন পুরুষকে অনেক বেশি মার্জিত, ভারসাম্যপূর্ণ এবং বিবেচনাবোধ সম্পন্ন হতে হবে। যদি সে পুরোপুরি সচেতন না থাকে, যদি তাকে কেউ চাপ দেয় কিংবা যদি আক্রোশ বা রাগ থেকে সে এমন কিছু করে বসে বা বলে ফেলে যা সে করতে চায়নি, তাহলে তার কোনো বৈধতা ও কার্যকারিতা থাকে না।

> মুহাম্মাদ ইবনু উবাইদ ইবনু আবু সালিহ রহমাতুল্লাহি আলাইহি থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আদী ইবনু আদী আল-কিনদীর সঙ্গে সিরিয়া থেকে রওনা হয়ে মক্কায় গেলাম। তিনি আমাকে সাফিয়্যাহ বিনতু শাইবার কাছে পাঠালেন। কেননা সাফিয়্যাহ আয়িশা রদিয়াল্লাহু আনহা থেকে হাদিস সংরক্ষণ করেছিলেন। তিনি বলেন, আমি আয়েশা রদিয়াল্লাহু আনহাকে বলতে শুনেছি, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, রাগের অবস্থায় কোনো তালাক হয় না। এবং দাসত্বমুক্ত করা যায় না।
>
> আবু দাউদ ২১৯৩

ইমাম আবু দাউদ রহমাতুল্লাহি আলাইহি এই হাদিসের বিষয়ে বলেন, এই হাদিসে 'আল-গিলাক' শব্দটি উল্লেখ করা হয়েছে। আমার মতে এর অর্থ রাগ। অন্য কিছু মুহাদ্দিস অবশ্য বলেছেন, আল গিলাক মানে জোরপূর্বক কিছু করা। আসলে দুটো অর্থই সঠিক।

তালাক কেবল তখনই কার্যকর হবে যদি স্বামী সজ্ঞানে ও সচেতনভাবে তার স্ত্রীকে তালাক দিতে চান এবং তার থেকে আলাদা হতে চান। কিন্তু যদি তিনি কসম কাটার জন্য বা ব্ল্যাকমেইল করার জন্য বলেন কিংবা হুমকি দিতে গিয়ে এমনটা বলেন তাহলে তা তালাক হিসেবে কার্যকর হবে না।

ইসলামের প্রাথমিক যুগের স্কলারগণ এমনই মত দিয়ে গেছেন। ইবনে তাইমিয়া রহমাতুল্লাহি আলাইহি এবং ইবনে কাইয়্যিম রহমাতুল্লাহি আলাইহি-ও এমন মতই ব্যক্ত করেছেন।

যদি এ ধরনের তালাক কার্যকর না হয়, তাহলে বুঝা যায় যে, শুধুমাত্র সেই তালাকগুলোই বৈধ যা নিয়তের মাধ্যমে এবং সময় নিয়ে সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রয়োগ করা হয়। যখন স্বামী গভীরভাবে চিন্তা করার পর সিদ্ধান্তটি চূড়ান্ত করে এবং মনে করেন যে, এই দুঃসহ জীবন থেকে বাঁচার জন্য এটাই একমাত্র উপায়, তখনই তালাকটি কার্যকর হয়।

> ইবনে আব্বাস রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তালাক তখনই কার্যকর হয় যখন তা নিয়ত করে করা হয়। বুখারি ৬ : ৬৮

৮.৪ তালাক পরবর্তী পরিস্থিতি

তালাক হয়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গেই বিয়ের সম্পর্কটি মৌখিকভাবে বিচ্ছিন্ন হবে না। কারণ, কুরআন বলছে :

اَلطَّلَاقُ مَرَّتٰنِ ۖ فَاِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌۢ بِاِحْسَانٍ

> তালাক (তালাকে রাজঈ) দুবার। তারপর হয় ন্যায়সঙ্গতভাবে রাখবে, না হয় কোমলতার সঙ্গে বর্জন করবে। সূরা আল বাকারা ২ : ২২৯

প্রথমবার তালাক দেয়ার পরও প্রতিটি তালাকদাতা পুরুষ অন্তত দুবার তার আগের স্ত্রীর কাছে ফিরে যেতে পারে এবং পরিস্থিতিকে আগের মতো বানানোর চেষ্টা করতে পারে। যদি পরপর দুবার তালাক দেয়া হয় এবং এই সময়ের মধ্যবর্তী সময়েও তাদের মানসিকতা যদি পরিবর্তিত না হয়, তাহলে তৃতীয় যে তালাকটি দেয়া হবে তা চূড়ান্ত এবং কার্যকর বলে গণ্য হবে। এরপর চাইলেও স্বামী আর তার স্ত্রীর কাছে ফিরতে পারবে না। যতক্ষণে সেই স্ত্রী অন্য একজন পুরুষকে বিয়ে না করে এবং সেই দ্বিতীয় স্বামী মারা যায় বা তাকে তালাক দেয়।

তাই তিনটি তালাককে সময়ের ব্যবধানে তিনবারে দেয়াই শরিয়ার বিধান। কেউ যদি তিনটি তালাককে একবারেই উচ্চারণ করে তাহলে তা কুরআনের

চেতনার বাইরে চলে যায়। শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহমাতুল্লাহি আলাইহি এবং তার ছাত্র ইবনুল কাইয়্যিম রহমাতুল্লাহি আলাইহি এই মত দিয়েছেন এবং অধিকাংশ আরব দেশে শরীয়া আদালতেও এই নীতিমালাই অনুসরণ করা হয়।

তালাক হয়ে গেলেও যতদিন তালাকের মেয়াদটি চলমান থাকবে ততদিন স্ত্রীর ভরণপোষণ স্বামীকেই দিতে হবে। ইদ্দতকালীন সময়ে এই খরচ পাওয়া স্ত্রীর অধিকার। এখানে ইদ্দত সম্পর্কে বলা দরকার। ইদ্দত হলো অপেক্ষাকাল।

১. যদি স্ত্রী গর্ভবতী হয় তাহলে সে এই সময়ের মধ্যে সন্তান প্রসব করতে পারে।
২. যদি স্ত্রী ঋতুবতী হয় তাহলে ৩টি পিরিয়ড শেষ করতে পারে। এবং
৩. অন্তত ৩টি মাস অপেক্ষা করা যে, স্ত্রীর মাসিক বন্ধ হয় কিনা।

তালাক হলেই একজন স্বামী তার স্ত্রীকে রাতারাতি বাসা থেকে বের করে দিতে পারে না। বরং স্ত্রীকে তার ঘরে রাখার জন্যই স্বামীকে তাগিদ দেয়া হয়েছে। এটা একটি পরোক্ষ প্রচেষ্টাও বটে, যাতে তাদের দুজনের প্রতি সহানুভূতিটি ফের জাগ্রত হয়। আল্লাহ বলেন :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا۟ ٱلْعِدَّةَ ۖ
وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنۢ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّآ أَن
يَأْتِينَ بِفَٰحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ
فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُۥ ۚ لَا تَدْرِى لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا

হে নবী! তোমরা যখন স্ত্রীদেরকে তালাক দিতে চাও, তখন তাদের ইদ্দতের প্রতি লক্ষ্য রেখে তালাক দিও আর ইদ্দত গণনা করবে। তোমরা তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করবে। তাদেরকে তাদের গৃহ থেকে বহিষ্কার করবে না এবং তারাও যেন বের না হয় যদি না তারা কোনো সুস্পষ্ট নির্লজ্জ কাজে লিপ্ত হয়। এগুলো আল্লাহর নির্ধারিত সীমা। যে ব্যক্তি আল্লাহর সীমালংঘন করে, সে নিজেরই অনিষ্ট করে। সে জানে না, হয়ত আল্লাহ এই তালাকের পর কোনো নতুন উপায় করে দেবেন।

সূরা আত তালাক ৬৫ : ১

তালাক কার্যকর হলেও একজন স্বামী তার স্ত্রীর দেনমোহর আটকে দিতে পারে না। আবার তাকে এতদিন যা দেয়া হয়েছিল তাও নিয়ে নিতে পারে না। আল্লাহ বলেন :

وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْـًٔا

তাদের কাছ থেকে নিজের দেয়া সম্পদ থেকে কিছু ফিরিয়ে নেয়া তোমাদের জন্য বৈধ নয় । সূরা আল বাকারা ২ : ২২৯

সামাজিক প্রথার আলোকে যে মুতা নির্ধারিত হয় তা থেকেও তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে বঞ্চিত করার কোনো সুযোগ নেই। মুতা হলো নিয়মিত ভরণপোষণের বাইরে আলাদা কোনো উপহার যা স্বামীর পক্ষ থেকে স্ত্রীকে দেয়া হয়। আল্লাহ বলেন :

وَلِلْمُطَلَّقٰتِ مَتَاعٌۢ بِالْمَعْرُوْفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ

আর তালাকপ্রাপ্তা নারীদের জন্য থাকবে ভরণপোষণ, মুত্তাকীদের ওপর আবশ্যকীয়। সূরা আল বাকারা ২ : ২৪১

তালাক দেয়ার পর একজন স্বামীকে তার পূববর্তী স্ত্রী সম্পর্কে নেতিবাচক মন্তব্য ছড়াতে, গুজব তৈরি করতে এবং অপবাদ দিতে নিষেধ করা হয়েছে। এমনকি স্ত্রীর পরিবারকে নিয়েও কোনো ধরনের বাজে মন্তব্য করা যাবে না। আল্লাহ বলেন :

اَلطَّلَاقُ مَرَّتٰنِ ۖ فَاِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌۢ بِاِحْسَانٍ

তালাক (তালাকে রাজঈ) দুবার । তারপর হয় ন্যায়সঙ্গতভাবে রাখবে, না হয় কোমলতার সঙ্গে বর্জন করবে। সূরা আল বাকারা ২ : ২২৯

আল্লাহ আরো বলেন :

وَاَنْ تَعْفُوْٓا اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۗ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ

আর তোমরা পুরুষরা যদি ক্ষমা করো, তবে তা হবে উন্নত তাকওয়ার নিদর্শন। আর বিগত সময়ের পারস্পরিক সহানুভূতির কথা ভুলে যেও না।
সূরা আল বাকারা ২ : ২৩৭

ইসলাম তালাককে অনুমোদন করেছে। সঠিক সময়ে, সঠিক কারণে, সঠিক উপায়ে এবং সঠিক নিয়তে তালাক সংঘটিত হলে তা কল্যাণকর হতে পারে। অন্যদিকে, খৃস্টান ধর্মে ক্যাথলিকদের জন্য তালাকের পথকে সম্পূর্ণ রুদ্ধ করে দেয়া হয়েছে। শুধুমাত্র ব্যাভিচার হলেই তালাক দেয়া যাবে বলে সেখানে মতামত দেয়া হয়েছে। অর্থোডক্স চার্চেও এ ধরনের প্রথাকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তাদের যুক্তি হলো, সৃষ্টিকর্তা যে দম্পতিকে এক করে পাঠিয়েছেন মানুষ তাকে আলাদা করতে পারে না। আমরা বিশ্বাস করি, আল্লাহই দুটো মানুষকে এক করেন আবার

তিনিই তাঁর প্রদত্ত বিধানের আলোকে তাদেরকে বিচ্ছিন্নও করতে পারেন।

আল্লাহ তাঁর বান্দাদের কল্যাণের জন্যই যাবতীয় আইন কানুন প্রণয়ন করেছেন। মানুষের জন্য কোনটা জরুরি, তা সৃষ্টিকর্তা হিসেবে তিনিই সবচেয়ে ভালো জানেন। খৃস্টধর্মে বিষয়টিকে নিষিদ্ধ করে কিন্তু আটকানো যায়নি। ফলে অনেকেই নিষিদ্ধ সীমানার বাইরে গিয়ে তালাক দিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু ধর্মে বিষয়টি স্পষ্ট না থাকায় অনেক খৃস্টান সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশকেই বাধ্য হয়ে স্থানীয় পর্যায়ে ইসলামের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নতুন আইন করতে হচ্ছে।

ইসলাম ধর্মের তালাক সংক্রান্ত বিধিমালাকে অনেকেই হালকা মনে করে। তারা তালাকটিকে খুব সহজ বানিয়ে ফেলতে চায়। তুচ্ছ কারণেও তালাক দেয়ার অসংখ্য ঘটনাও ঘটছে। আর এমনটা হচ্ছে বলেই অনেকের দাম্পত্য জীবনই অপমানের মুখে পড়ছে এবং পরিণতিতে তারা বিপর্যস্ত অবস্থায় পড়ে যাচ্ছে।

৮.৫ তালাক কেন পুরুষদের দায়িত্বে ন্যাস্ত

অনেকেই প্রশ্ন করেন, তালাকের প্রক্রিয়াটি কেন পুরুষরা আগে শুরু করে? এর উত্তর হলো পুরুষরাই পরিবারের প্রধান অভিভাবক ও ভিত্তি। পুরুষই দেনমোহর প্রদান করে। সম্পর্ক যতদিন টিকে ততদিন পরিবারের ভরণ-পোষণের কাজটিও পুরুষকেই করতে হয়। যে পরিবারের জন্য সে এতটা ত্যাগ স্বীকার ও পরিশ্রম করে, সেই পরিবারকে সে খুব সহজেই ভেঙে যেতে দিতে চাইবে না। খুব কঠিন যুক্তি ও উপযুক্ত কার্যকারণ না থাকলে একজন পুরুষ সংসারটিকে শেষ করতে চাইবে না। কেননা, এতে সংসারের ওপর তার যাবতীয় বিনিয়োগই বিফলে যায়।

আরেকটি বড় কারণ হলো, মানুষ অধিকাংশ ক্ষেত্রে চটজলদি সিদ্ধান্ত নেয় আবেগের বশবর্তী হয়ে। পুরুষের যেহেতু আবেগ তুলনামূলক কম, তাই তার পক্ষে কিছুটা হলেও ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করা সহজ। অন্যদিকে, মহিলারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আবেগের দ্বারা প্রভাবিত হয়। বিশেষ করে, পিরিয়ড চলাকালীন তাদের আবেগ খুব উঠানামা করে।

সকল তালাকের ঘটনাই আদালত পর্যন্ত নেয়া সমীচিন নয়। সকল পক্ষের স্বার্থ এভাবে রক্ষা করা যায় না। তাছাড়া তালাকের বিষয়টিকে জনসম্মুখে নিয়ে আসতেও সব দম্পতি হয়ত রাজি হবে না। কিংবা আইনজীবীদের কাছে ধর্ণা দেয়ার মাধ্যমে এ বিষয়টিকে অনেক মানুষের মুখরোচক আলাপে পরিণত করতেও তারা আগ্রহী হবে না। কিন্তু পশ্চিমাদেশগুলোতে তালাকের একমাত্র বৈধ উপায় হলো আদালতের কাছে শরনাপন্ন হওয়া। কিন্তু এতে তালাকের হার কমে না। আর আদালত অধিকাংশ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দম্পতিকে মিলিয়ে দিতেও ব্যর্থ হয়।

৮.৬ স্ত্রী কখন ও কীভাবে স্বামীকে তালাক দিতে পারবে

অনেকের মনেই এ প্রশ্নটি আসে যে, যদি পুরুষরাই তালাকের মূল উদ্যোগটি গ্রহণ করে, কিংবা তালাক দেয়ার জন্য যেসব ঘটনা বা প্রয়োজনীয়তা থাকতে হয়, সেগুলো যদি পুরুষদের জন্য প্রযোজ্য হয়, তাহলে একজন মহিলার কি তালাক দেয়ার কোনো সুযোগ নেই? সে কীভাবে তালাক দেবে? একজন স্ত্রী যদি তার স্বামীর অত্যাচার ও জুলুমের কারণে অতীষ্ঠ হয়ে যায়, স্বামী যদি তার সঙ্গে ক্রমাগতভাবে দুর্ব্যবহার করে কিংবা স্বামী হিসেবে ন্যূনতম দায়িত্বও পালন না করে তাহলে স্ত্রী সেই স্বামীর হাত থেকে কীভাবে মুক্তি পাবে? কিংবা কোনো স্বামী যদি শারীরিকভাবে অক্ষম হয় বা ভরণপোষণের সামান্য দায়িত্বও পালন করতে না পারেন তাহলে স্ত্রী তার ব্যাপারে কী করতে পারেন?

এ বিষয়ে আল্লাহ তাআলাই উত্তর দিয়েছেন এবং মহিলাদের জন্য বিধান জারি করে দিয়েছেন যার মধ্য দিয়ে তারা এসব সঙ্কট থেকে বেরিয়ে আসতে পারেন।

১. বিয়ের চুক্তিপত্রে মেয়েদেরকে তালাক দেয়ার সুযোগ থাকতে হবে। ইমাম আবু হানিফা রহমাতুল্লাহি আলাইহি এবং ইমাম আহমাদ রহমাতুল্লাহি আলাইহি এ বিষয়টিকে সমর্থন করেছেন।

   উকবাহ ইবনে আমির রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, শর্তসমূহের মধ্যে যা পূর্ণ করার সর্বাধিক দাবী রাখে তা হলো সেই শর্ত যা তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের জন্য হালাল করেছ। বুখারী ২৭২১, মুসলিম ১৪১৮

২. যে স্ত্রী তার স্বামীকে অপছন্দ করে সে একটি খুলা বা জরিমানা দেয়ার মাধ্যমে তার থেকে আলাদা হয়ে যেতে পারে। যেহেতু, স্ত্রী আগেই দেনমোহর হিসেবে স্বামীর কাছ থেকে কিছু পেয়েছে, তাই সেগুলোর একটি সুরাহা না করেই যদি স্ত্রী হুট করে তালাক চেয়ে বসে বা বিয়ের চুক্তিকে মানতে অস্বীকার করে তাহলে তার স্বামী লোকসানের মুখে পড়ে যেতে পারে। আল্লাহ বলেন :

   فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ○

   এরপর যদি তোমাদের ভয় হয় যে, তারা উভয়েই আল্লাহর সীমারেখা বজায় রাখতে পারবে না, তাহলে সেক্ষেত্রে স্ত্রী যদি বিনিময় দিয়ে অব্যাহতি নিতে চায়, তবে উভয়ের মধ্যে কারোরই কোনো পাপ নেই। এটাই হলো

আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সীমা। কাজেই একে অতিক্রম করবে না। বস্তুত যারা আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত সীমালঙ্ঘন করবে, তারাই জালিম।

সূরা আল বাকারা ২ : ২২৯

ইবনে আব্বাস রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। সাবিত ইবনে কায়স এর স্ত্রী রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে এসে বলল, হে আল্লাহ্‌র রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! চরিত্রগত বা দীনী বিষয়ে সাবিত ইবনে কায়সের ওপর আমি দোষারোপ করছিনা। তবে আমি ইসলামের ভিতরে থেকে কুফরী করা (অর্থাৎ স্বামীর সঙ্গে অমিল) পছন্দ করছি না। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তুমি কি তার বাগানটি ফিরিয়ে দেবে? সে বলল, হ্যাঁ। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তুমি বাগানটি গ্রহণ করো এবং মহিলাকে এক তালাক দিয়ে দাও।

বুখারি ৪৭৮১ (ইসলামিক ফাউন্ডেশন)

৩. যদি স্বামী স্ত্রী সমঝোতার মাধ্যমে বা কোনো ধরনের সালিশের শরণাপন্ন হয়। আল্লাহ বলেন :

وَاِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوْا حَكَمًا مِّنْ اَهْلِهٖ وَحَكَمًا مِّنْ اَهْلِهَا ۚ اِنْ يُّرِيْدَآ اِصْلَاحًا يُّوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمَا ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا خَبِيْرًا ۝

যদি তাদের মধ্যে সম্পর্কচ্ছেদ হওয়ার মতো পরিস্থিতির আশঙ্কা করো, তবে স্বামীর পরিবার থেকে একজন এবং স্ত্রীর পরিবার থেকে একজন সালিস নিযুক্ত করবে। তারা উভয়ে মিমাংসা চাইলে আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, সবকিছু অবহিত।

সূরা আন নিসা ৪ : ৩৫

কুরআনের এই বর্ণনা অনুযায়ী পারিবারিক পরামর্শক বা মিমাংসাকারী বলতে এমন দুজন ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে, যাদেরকে স্বামী ও স্ত্রী বাছাই করেছে। তাদের সিদ্ধান্ত দেয়ার বা মিমাংসা করার এখতিয়ার থাকবে। রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাহাবীরা প্রায়ই এ ধরনের মিমাংসাকারীদেরকে উদ্দেশ্য করে বলতেন, তোমাদের ঘাড়ে অনেক বেশি দায়িত্ব। তোমরা চাইলে একটি দম্পতিকে এক করে দিতে পারো আবার তাদেরকে বিচ্ছিন্নও করে ফেলতে পারো।

৪. স্বামীর শারীরিক অক্ষমতার কারণে স্ত্রী তাকে তালাক দিতে পারবে। যদি স্বামীর এমন কোনো দুর্বলতা থাকে যার কারণে স্ত্রীর যৌন চাহিদা পূরণ করতে পারছে না, তাহলে স্ত্রী সেই অভিযোগটি আদালতে উত্থাপন করে তালাক চাইতে পারবে। স্ত্রী নিজেকে ক্ষতি থেকে বাঁচানোর জন্য এমনটা

করতেই পারে।

৫. যদি কোনো স্বামী স্ত্রীর কোনো ক্ষতি করে, তাকে আঘাত করে, অন্যায়ভাবে তাকে বন্দী করে রাখে, নিয়মিতভাবে তাকে এড়িয়ে যায় বা অগ্রাহ্য করে যায় তাহলে স্ত্রী এই স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে তালাক চাইতে পারবে। সেক্ষেত্রে বিচারক সেই স্ত্রীকে সম্ভাব্য ক্ষতি থেকে বাঁচানোর উদ্দেশ্যে তালাক কার্যকর ঘোষণা করতে পারবেন। আল্লাহ্ বলেছেন :

وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا

তোমরা জ্বালাতন ও বাড়াবাড়ি করার উদ্দেশে তাদের আটকে রেখ না।
সূরা আল বাকারা ২ : ২৩১

আল্লাহ্ আরও বলেন :

فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

তারপর হয় ন্যায়সঙ্গতভাবে রাখবে, না হয় সহৃদয়তার সঙ্গে বর্জন করবে।
সূরা আল বাকারা ২ : ২২৯

কোনো কোনো স্কলার এই মর্মে মতামত দিয়েছেন, নারীরা কোনো কারণে ক্ষতির সম্মুখীন হলেই তালাকের জন্য আবেদন করতে পারবে। যদি স্বামী তাদেরকে প্রয়োজনমতো ভরণপোষণ সরবরাহ্ করতে না পারে তাহলেও স্ত্রী এ ধরনের আবেদন করতে পারবে। একজন নারী ক্ষুধার যন্ত্রণায় কষ্ট পেয়ে যদি সহ্য করতে না পারে তাহলে ইসলাম তাকে অন্ধভাবে স্বামীর আনুগত্য করে যাওয়ার কথা বলে না।

এ আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, ইসলাম নারীর ক্ষেত্রে স্বামীর বর্বরতা বা অন্যায্য আচরণ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য দুয়ার খুলে রেখেছে। একজন নারীর অধিকার যদি ক্রমাগতভাবে খর্ব করা হয় তাহলে সেভাবে অসহায় অবস্থায় জীবন যাপন করার কোনো মানে হয় না।

বিভিন্ন দেশে ও সভ্যতায় পুরুষরা অনেকগুলো আইন করেছে যা নারীর অধিকারকে ক্ষুণ্ন করেছে। কিন্তু আল্লাহ্ সৃষ্টিকর্তা হিসেবে নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্য যে আইন প্রণয়ন করেছেন তাতে কোনো অবিচার নেই। সেখানে পরিপূর্ণভাবে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। আল্লাহ্ বলেন :

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا

كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ

তোমরা কখনও নারীদেরকে সমান রাখতে পারবে না, যদিও এর আকাঙ্খী হও। অতএব, একজনকে দোদুল্যমান অবস্থায় রেখে আরেকজনের দিকে ঝুঁকে পড়বে না। সূরা আন নিসা ৪ : ১২৯

৮.৭ তালাকের অপব্যবহার

এটা বলা অনুচিত হবে না যে, অনেক মুসলিম তালাকের অপপ্রয়োগ করেছে এবং স্ত্রীকে মজলুম অবস্থায় ফেলে ভুল বাস্তবতায় তালাকের বাস্তবায়ন করেছে। তারা অনেক ছোট বা বড় ইস্যুকে নিজেদের পক্ষে নেয়ার জন্য অযাচিতভাবে এর উচ্চারণ করেছে। বেশ কিছু স্কলার অবশ্য তালাকের পরিধিকে অনেক বড় করে ফেলেছেন। তারা মাতাল স্বামীর তালাক এবং ক্রুদ্ধ স্বামীর ঘোষণাকেও বিবেচনায় নিয়েছেন। যদিও হাদিসে বলা হয়েছে :

রাগে অন্ধ থাকা অবস্থায় তালাক কার্যকর হবে না। আবু দাউদ ৩১৩৩

ইবনে আব্বাস রদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, তালাক হয় তখনি যখন তা তালাকের নিয়তে দেয়া হয়। অথচ, কোনো স্বামী যদি প্রচন্ড রাগ থেকে একসাথে তিনবার তালাক দিয়ে দেয় অথবা হুমকি দেয়ার নিয়তে যদি তালাক শব্দটি উচ্চারণ করে, তাহলেও এসব স্কলার সেই তালাককে কার্যকর বলে মনে করছেন। হতে পারে, সেই স্বামীটি স্ত্রীকে ছাড়তে চান না, তিনি তাকে নিয়ে সুখেই আছেন। তারপরও কোনো কারণে হয়ত বলে ফেলেছেন। এই স্কলারগণ সেই সাময়িক উত্তেজনার উচ্চারণটিকেই চূড়ান্ত অবস্থান হিসেবে বিবেচনা করছেন।

যাহোক, কুরআনের বিপুল সংখ্যক আয়াত ও হাদিস দিয়ে ইসলামের ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিভঙ্গিকে তুলে ধরতে চেয়েছি। কারণ, পরিবারকে ধরে রাখতে হলে ক্ষমা ও মেনে নেয়ারও প্রয়োজন পড়ে। কোনো একটি সময়ে কে কি উচ্চারণ করল বা কি কারণে বলল, তাকেই চূড়ান্ত মনে করার সুযোগ নেই। সর্বোপরি, আমাদেরকে আল্লাহর ফায়সালাকেই মেনে নিতে হবে। এই দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের পূর্বসুরী বিশেষ করে ইমাম বুখারি রহমাতুল্লাহি আলাইহি, ইমাম তাইমিয়া রহমাতুল্লাহি আলাইহি ও ইমাম ইবনুল কাইয়্যুম রহমাতুল্লাহি আলাইহি লালন করতেন। এটাই ইসলামের প্রকৃত চেতনা। কিন্তু এরপরও কেউ যদি ইসলামের বিধানের কোনো অপব্যবহার বা অপপ্রয়োগ করে তার দায় সেই ব্যক্তির, অবশ্যই ইসলামের নয়।

৯

বহুবিবাহ

খৃস্টান মিশনারী এবং প্রাচ্যবিদরা বহুবিবাহকে এমনভাবে উপস্থাপন করে যেন বহুবিবাহের এ প্রথাটি ইসলামের একটি মৌলিক ইবাদত। অথবা ইসলামের বাধ্যতামূলক কোনো দায়িত্ব কিংবা খুব কাঙ্ক্ষিত কোনো ধর্মীয় অনুশীলন। এটা সম্পূর্ণ ভুল এবং সত্যের নির্মম বিকৃতি ছাড়া আর কিছু নয়। ইসলামের নির্দেশনা অনুযায়ী একজন মুসলিম পুরুষকে সাধারণভাবে একজন নারীকেই বিয়ে করতে হয়। এমন একজন নারী যিনি তার নিঃসঙ্গতায় সঙ্গী হবেন, অন্তরে স্বস্তি ও প্রশান্তির কারণ হবেন, তার বাসা-বাড়ি ও সম্পদের জিম্মাদার হবেন এবং সংসারের যাবতীয় গোপন বিষয়কে বিশ্বস্ততা ও আমানতদারিতার সঙ্গে সংরক্ষণ করবেন।

কুরআনের চেতনা অনুযায়ী, পারস্পরিক ভাব, ভালোবাসা, মায়া, সম্মান এবং সহানুভূতিই হলো একটি সুষ্ঠু বিয়ের মূল ভিত্তি। এ কারণে, কোনো ব্যক্তির স্ত্রী যদি সতী ও মার্জিত হয় এবং স্বামীর যাবতীয় অধিকার পূরণ করে, তাহলে সেই স্ত্রীকে রেখে ওই স্বামী যদি আরেকজনকে বিয়ে করা তাহলে তা কখনোই ইতিবাচকভাবে বিবেচনা করা যাবে না। বরং এমন না করার জন্যই তাকে তাগিদ দেয়া হয়েছে। আল্লাহ বলেন :

وَلَنْ تَسْتَطِيْعُوْٓا اَنْ تَعْدِلُوْا بَيْنَ النِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا
تَمِيْلُوْا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوْهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ؕ وَاِنْ تُصْلِحُوْا وَتَتَّقُوْا
فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۝

তোমরা কখনও নারীদেরকে সমান রাখতে পারবে না, যদিও এর আকাঙ্ক্ষী হও। অতএব, একজনকে দোদুল্যমান অবস্থায় রেখে আরেকজনের দিকে একেবারে ঝুঁকে পড়বে না। যদি সংশোধন করো এবং তাকওয়া অবলম্বন করো, তবে আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুণাময়। সূরা আন নিসা ৪ : ১২৯

আবু হুরাইরা রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে লোকের নিকট দুজন স্ত্রী আছে সে লোক যদি তাদের মধ্যে সমতা না রাখে তবে কিয়ামতের দিন ওই ব্যক্তি তার দেহের এক পার্শ্ব ভাঙ্গা অবস্থায় উপস্থিত হবে। তিরমিজি ১১৪১, ইবনু মাজাহ ১৯৬৯

যে পুরুষ দ্বিতীয় স্ত্রী রাখার সামর্থ রাখে না অথবা তার মধ্যে আশঙ্কা থাকে যে,

সে তার দুই স্ত্রীর মধ্যে সমপরিমাণ ভারসাম্য রাখতে পারবে না, তাকে দ্বিতীয় বিয়ে করতে নিষেধ করা হয়েছে। আল্লাহ্ বলেন :

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ○

> যদি এমন আশঙ্কা করো যে, তাদের মধ্যে ন্যায়সঙ্গত আচরণ বজায় রাখতে পারবে না, তবে একটিই অথবা তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসীদেরকে; এতে পক্ষপাতিত্বে জড়িত না হওয়ার অধিকতর সম্ভাবনা বিদ্যমান।
>
> সূরা আন নিসা ৪ : ৩

সমতা ও শান্তি বজায় রাখতে না পারার আশঙ্কা থাকায় এবং এর পরিণতিতে দুনিয়ায় অশান্তি ও আখেরাতে শাস্তি পাওয়ার সম্ভাবনা থাকায় পুরুষদেরকে একটি বিয়ে করারই তাগিদ দেয়া হয়েছে। তবে, ব্যক্তি ও সামাজিক বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে কখনো আরো কিছু বিষয়ের বিবেচনা করার প্রয়োজন পড়ে যায়। আমরা পরবর্তীতে সেই বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলব যে, ঠিক কোন কারণে একজন পুরুষের পক্ষে একাধিক বিয়ে করার সুযোগ রয়েছে। ইসলামে এ বিধানগুলো রাখা হয়েছে কারণ ইসলাম মানুষের সহজাত সঙ্কটগুলোকে স্বীকার করে। ইসলাম সমস্যা থেকে পালিয়ে যাওয়ার মতো দীন নয়। ইসলামে কোনো ধরনের অযৌক্তিক অতিরঞ্জনেরও কোনো স্থান নেই।

৯.১ প্রাচীনকালের বহুবিবাহ বনাম ইসলাম অনুমোদিত বহুবিবাহ

কিছু মানুষের কথা শুনলে মনে হয়, বহুবিবাহের বিধান বোধ হয় ইসলামই সবার আগে চালু করেছে। এটা ইতিহাসের ও সত্যের ভয়াবহ বিকৃতি। ইসলামের আগেই বহু ধর্ম ও দর্শন পুরুষকে অসংখ্য নারীকে বিয়ে করার সুযোগ দিয়েছে। কোনো কোনো ধর্মবিশ্বাসে তো একজন পুরুষ দশ বা শখানেক নারীকেও বিয়ে করতে পারে। আবার কোনো কোনো ধর্মমতে নারীকে বিয়ে করার কোনো সংখ্যা বা কোনো ধরনের কোনো সীমানা নেই। যে যাকে খুশি বিয়ে করতে পারে, কোনো ধরনের শর্ত বা নিয়মের তোয়াক্কা না করেই। পুরনো বাইবেল থেকে জানা যায়, ডেভিডের অধীনে ছিল তিনশ নারী আর সলোমানের ছিল সাতশ জন। এদের অনেকেই স্ত্রীর মর্যাদা পেয়েছেন, আবার কেউ হয়ত দাসী হিসেবেই চিত্রিত হয়েছেন বরাবর।

ইসলামের আগমনের পর, বহুবিবাহের ক্ষেত্রে বরং সীমানা টেনে দেয়া হয়। নানা ধরনের শর্তারোপ করা হয়। ইসলাম শর্তসাপেক্ষে বহুবিবাহ অনুমোদন করলেও স্ত্রীর সংখ্যা সর্বোচ্চ চার জনে বেধে দিয়েছে। গাইলান ইবনে সালামাহ যখন ইসলাম গ্রহণ করেন তখন তার স্ত্রীর সংখ্যা ছিল দশ জন। তাই রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, এই দশ জনের মধ্যে চার

জনকে তোমার সঙ্গে রাখ আর বাকিদেরকে তালাক দিয়ে দাও। মূল হাদিসটি এরকম :

> ইবনু উমার রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে সময়ে গাইলান ইবনু সালামা আস-সাকাফী ইসলাম গ্রহণ করেন সে সময়ে তার দশজন স্ত্রী ছিল, যাদের তিনি জাহেলী যুগেই বিয়ে করেছিলেন। তার সঙ্গে তারাও মুসলমান হয়। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে এদের মধ্যে যে কোন চারজনকে বেছে নেয়ার নির্দেশ দেন।
>
> তিরমিজি ১১২৮, ইবনু মাজাহ ১৯৫৩

ইসলাম গ্রহণের পূর্বে যারা আট জন বা পাঁচ জনকে বিয়ে করেছিলেন, ইসলাম গ্রহনের পর তাদের সবাইকে একই প্রথাই মেনে নিতে হয়। অর্থাৎ তাদের সবাইকেই রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বোচ্চ চারজন স্ত্রীকে সঙ্গে রাখার নির্দেশ দেন।

রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কেন নয় জন (মতান্তরে এগার জন) কে বিয়ে করেছিলেন তার বিষয়ে অনেকগুলো ব্যাখ্যা আছে। প্রথমত তাঁর বিষয়টি পুরোই ভিন্ন, আর আল্লাহ তাআলাই বিষয়টিকে চূড়ান্ত করেছেন। ইসলামের বিভিন্ন বিধান ও প্রথা প্রতিষ্ঠা করার জন্য এর প্রয়োজন ছিল। আর রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ওফাতের পর উম্মুল মুমিনিনদের কাছ থেকে উম্মত অনেক কিছু জানতে পেরেছে। তাই উম্মুল মুমিনিনের সংখ্যা বেশি হওয়া উম্মতের জন্য কল্যাণকর ও আশীর্বাদ হিসেবে পরিগণিত হয়েছে।

রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সীরাত থেকে জানা যায়, তিনি সবচেয়ে বেশি সময় একজন স্ত্রীর সঙ্গেই কাটিয়েছেন এবং তখন অবধি তার বিয়ে একটিই ছিল। আর সেই সৌভাগ্যবান স্ত্রী হলেন উম্মুল মুমিনিন খাদিজা রদিয়াল্লাহু আনহা। এই উম্মুল মুমিনিনগণ উম্মতের জন্য অনেক বড় নেয়ামত। তাদেরকে আল্লাহই রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দুনিয়া ও আখেরাতের সঙ্গীনী হিসেবে বাছাই করেছেন।

তাই রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এই বাছাইকৃত সঙ্গীনীদের বাইরে কাউকে বিয়ে করতে আল্লাহ নিষেধ করেছেন কিংবা একজনের পরিবর্তে অন্য কাউকে বিয়ে করার সুযোগও রদ করেছেন। আল্লাহ বলেন :

لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَآءُ مِنْۢ بَعْدُ وَلَآ اَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ اَزْوَاجٍ وَّلَوْ اَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ

এরপর আপনার জন্যে কোনো নারী হালাল নয় এবং তাদের পরিবর্তে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করাও হালাল নয় যদিও তাদের রূপলাবণ্য আপনাকে মুগ্ধ করে। সূরা আল আহযাব ৩৩ : ৫২

৯.২ বহুবিবাহের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা অপরিহার্য

ইসলাম বহুবিবাহের ক্ষেত্রে যে শর্তগুলো নির্ধারণ করেছে তার মধ্যে প্রথমটি হলো, পুরুষকে অর্থাৎ স্বামীকে শতভাগ আত্মবিশ্বাসী হতে হবে যে, তিনি তার একাধিক স্ত্রীর মধ্যে খাদ্য, পানীয়, পোশাক, বসতবাড়ি এবং ভরণপোষণের দিক থেকে সম্পূর্ণ ভারসাম্য নিশ্চিত করতে পারবেন এবং এক্ষেত্রে তিনি পুরোপুরি স্বচ্ছতা বজায় রাখবেন। যদি কোনো ব্যক্তি উপর্যুক্ত দায়িত্বগুলো পালন করার বিষয়ে সংশয়ে থাকেন তাহলে তাকে একটির বেশি বিয়ে করতে নিষেধ করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন :

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ○

> যদি এমন আশঙ্কা করো যে, তাদের মধ্যে ন্যায় সঙ্গতআচরণ বজায় রাখতে পারবে না, তবে একটিই অথবা তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসীদেরকে; এতে পক্ষপাতিত্বে জড়িত না হওয়ার অধিকতর সম্ভাবনা বিদ্যমান।
> সূরা আন নিসা ৪ : ৩

> আবু হুরাইরা রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে লোকের কাছে দুজন স্ত্রী আছে সে যদি তাদের মধ্যে সমতা না রাখে তবে কিয়ামতের দিন সে তার দেহের এক পার্শ্ব ভাঙ্গা অবস্থায় উপস্থিত হবে। তিরমিজি ১১৪১, ইবনু মাজাহ ১৯৬৯

এই হাদিসে সমতা বলতে বুঝানো হয়েছে যে, একজন স্বামী কখনোই একজন স্ত্রীর অধিকার দিতে গিয়ে অপরজনকে অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে পারবে না। সমতা বলতে সব স্ত্রীর প্রতি সমান অনুভূতিকে বুঝানো হয়েছে। যদিও এই অনুভূতি কারো প্রতি একটু বাড়তি থাকতে পারে আর আশা করা যায়, আল্লাহ এ জন্য তাকে ক্ষমা করে দেবেন। তবে দৃশ্যমান যত ধরনের দায়িত্ব ও করনীয় আছে, সেগুলো অবশ্যই পালন করতে হবে। যেমনটা আল্লাহ বলেছেন :

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ
فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ○

> তোমরা কখনও নারীদেরকে সমান রাখতে পারবে না, যদিও এর আকাঙ্ক্ষী হও। অতএব, একজনকে দোদুল্যমান অবস্থায় রেখে আরেকজনের দিকে একেবারে ঝুঁকে পড়বে না। যদি সংশোধন করো এবং তাকওয়া অবলম্বন করো, তবে আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুণাময়। সূরা আন নিসা ৪ : ১২৯

এ কারণে রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার সকল স্ত্রীর মাঝে সমপরিমাণ বন্টনের কথা উঠলেই নিজের অপারগতার কথা স্বীকার করে বলতেন, হে আল্লাহ! এটা আমার বিভাজন ও বন্টন। আমি আমার সাধ্যমতো ভারসাম্য ও ইনসাফ করার চেষ্টা করেছি। ভারসাম্য প্রতিষ্ঠায় আপনার যে নিখুঁত সক্ষমতা আছে, আমার তা নেই। তাই আমার এই অক্ষমতাকে আপনি ক্ষমা করুন।

এ কথা দিয়ে তিনি বুঝিয়েছেন যে, তার হয়ত কোনো স্ত্রীর প্রতি একটু বাড়তি অনুভূতি থাকতে পারে। তারপরও রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রতিটি কাজের ক্ষেত্রেই অনেক বেশি সতর্ক ছিলেন। তাই তিনি যখন কোথাও কোনো সফরে বের হতেন এবং তার কোনো স্ত্রীকে নেয়ার প্রশ্ন আসত, তখন তিনি লটারি করতেন। যার নামটি লটারিতে উঠে আসত তিনি তাকেই সঙ্গে নিতেন। এমনটা তিনি করতেন যাতে কারো মধ্যে হিংসা ও পরশ্রীকাতরতা কাজ না করে এবং সকলেই তার সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট থাকে।

৯.৩ বহুবিবাহের নেপথ্যে প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতা

ইসলাম হলো আল্লাহ কর্তৃক মনোনীত একমাত্র দীন বা জীবন ব্যবস্থা, যার মধ্য দিয়ে অন্যসব মতবাদ ও চিন্তাধারাকে খারিজ করে দেয়া হয়েছে। এ কারণেই, ইসলাম এমন কিছু আইন ও বিধিবিধান নিয়ে পৃথিবীতে এসেছে যা সর্বকালের সব জাতি এবং জনগোষ্ঠীর কাছেই গ্রহণযোগ্য হয়। ইসলাম কখনোই এমন আইন প্রবর্তন করে না, যেখানে শহরবাসীর স্বার্থকে রক্ষা করা হয় আর গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর অধিকারকে অগ্রাহ্য করা হয়। এমনও কোনো বিধান ইসলামে নেই যা শীতপ্রধান অঞ্চলে প্রযোজ্য হলেও উষ্ণ অঞ্চলে নয়। এমন কিছুই ইসলামে বলা হয়নি, যা একটি প্রজন্মের জন্যেই প্রযোজ্য, অথচ পরবর্তী প্রজন্মের জন্য এর কোনো আবেদন নেই। ইসলাম একইসঙ্গে ব্যক্তি বিশেষ ও সামষ্টিক অর্থে গোটা জনগোষ্ঠীর স্বার্থকেই রক্ষা করে।

একজন স্বামীর হয়ত সন্তানের অনেক শখ, সেজন্য বিয়েও করল। কিন্তু বিয়ের পর জানল যে, যার সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছিল সে বন্ধ্যা অথবা অন্য কোনো কারণে সে বাচ্চা জন্ম দিতে পারবে না। তাহলে এই স্ত্রীরই কি উচিত না এমনটা সুযোগ করে দেয়া যাতে তার স্বামী অন্য কাউকে বিয়ে করে তার অপূর্ণ ইচ্ছাকে পূরণ করতে পারে? একজন স্বামী তার প্রথম স্ত্রীকে বহাল রেখে এবং তার যাবতীয় অধিকার ও মর্যাদা অক্ষুণ্ন রেখেই এরকম বাস্তবিক প্রয়োজনে দ্বিতীয় বিয়ে করতে পারে।

কিছু কিছু পুরুষ আছে সহজাতভাবে যাদের যৌন চাহিদা বেশি। যদি তার এমন

একজন মহিলার সঙ্গে বিয়ে হয় যার শারীরিক সম্পর্ক নিয়ে তেমন একটা আগ্রহ নেই। কিংবা যে মহিলাটি শারীরিকভাবে অসুস্থ বা দীর্ঘ সময় ধরে হয়ত তার মাসিক চলমান থাকে। ফলে, মহিলাটি স্বাভাবিকভাবেই তার স্বামীর যৌন আকাঙ্খাকে মেটাতে পারে না।

ফলশ্রুতিতে, তার স্বামীও অন্য মহিলাদের দিকে বাজেভাবে তাকাতে শুরু করে। স্বামী যেমন এক্ষেত্রে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না ঠিক তেমনি স্ত্রী যদিও স্বামীর এই আচরণগুলো পছন্দ করে না, কিন্তু তারও ভূমিকা পালন করার তেমন কোনো অবকাশ থাকে না। তাই বাজে দৃষ্টিতে অন্য মেয়েদেরকে দেখা কিংবা ভিন্ন কোনো নারীকে রক্ষিতা হিসেবে রেখে দেয়ার চেয়ে স্বামী যদি সেই মহিলাকে বিধিসম্মতভাবে বিয়ে করে তাই কি উত্তম নয়?

আবার এমনও হতে পারে যে, একটি দেশে বা জনপদে বিবাহযোগ্য মেয়ের সংখ্যা পুরুষদের তুলনায় অনেক বেশি। বিশেষ করে যুদ্ধ বিধ্বস্ত জনপদে এই সমস্যা বেশি দেখা যায়। তাই সমাজ এবং নারীকূলের জন্য এটা উত্তম যদি পুরুষ ব্যক্তিটি একাধিক বিয়ে করতে পারে। এটি সমাজ এবং নারী সম্প্রদায়, উভয়ের স্বার্থেই হতে পারে।

কেউ হয়ত তার সারা জীবন চিরকুমারী হিসেবে জীবনযাপন করার চেয়ে কিংবা বিবাহিত জীবন, ভালোবাসা, নিরাপত্তা এবং মাতৃত্বের আনন্দ থেকে বঞ্চিত হওয়ার তুলনায় বরং দ্বিতীয় স্ত্রী হয়ে থাকতেই বেশি পছন্দ করবে।

যে দেশে বা জনপদে মেয়েদের সংখ্যা পুরুষদের তুলনায় অনেক বেশি, তাদের জন্য তিনটি উপায় আছে। এগুলো হলো :

১. বিবাহ ও মাতৃত্বের স্বাদ থেকে বঞ্চিত হয়ে সারা জীবন একাকী পার করা। এটা হবে অপরাধ না করে শাস্তি পাওয়ার সমতুল্য।

২. তাদের আবেগের ডাকে সাড়া দেয়া। নিজের আকাঙ্ক্ষাকে অন্য কোনো অসৎ মানুষের সঙ্গে মিলে পূরণ করা। সেই অসৎ মানুষটিও হয়ত শরীরের চাহিদা পূরণ হওয়ার পর তাকে ছুঁড়ে ফেলে দেবে। যৌবনকাল চলে গেলে আর ফিরেও তাকাবে না।

তাছাড়া বিয়ে বহির্ভূত এসব অযাচিত শারীরিক সম্পর্ককে কেন্দ্র করে অসংখ্য অবৈধ সন্তানেরও জন্ম হয়। জন্মের আগেই পিতৃস্নেহ থেকে বঞ্চিত হওয়ায় এসব শিশুরা শারীরিক ও মানসিক অধিকারগুলোও আর পায় না।

ফলে, নাগরিক হিসেবে তারা অনুৎপাদনশীল মানুষে পরিণত হয়। সমাজের জন্যেও ধ্বংস আর বিপর্যয়ের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

৩. তারা বিবাহিত পুরুষদেরকে বিয়ে করতে পারে। বিশেষ করে ওই পুরুষদের যাদের অন্তত নিরাপত্তা ও ভরণপোষণ দেয়ার সক্ষমতা আছে। যারা আল্লাহর নির্দেশনা অনুযায়ী একাধিক স্ত্রীর মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার ক্ষেত্রেও আন্তরিক ও দৃঢ়বিশ্বাসী।

কোনো সন্দেহ নেই যে, প্রথম দুটি সমাধানের তুলনায় তৃতীয় সমাধানটি অনেক বেশি মানসম্মত ও বাস্তবানুগ। এ কারণেই আল্লাহ বলেছেন :

أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ○

তারা কি জাহেলিয়াত আমলের ফয়সালা কামনা করে? আল্লাহ অপেক্ষা বিশ্বাসীদের জন্য উত্তম ফয়সালাকারী কে? সূরা আল মায়েদা ৫ : ৫০

৯.৪ একটি নৈতিক ও মানবিক পন্থা হিসেবে বহুবিবাহ

ইসলামী শরীয়াতের নির্দেশনা অনুযায়ী বহুবিবাহ একটি নৈতিক ও মানবিক পন্থা। এটা নৈতিক এ জন্য যে, ইসলাম একজন পুরুষকে কখনোই যেকোনো নারীর সঙ্গে ইচ্ছামতো যৌন সম্পর্ক স্থাপনের সুযোগ দেয় না। ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে যেকোনো সময়ে যেকোনো পরিস্থিতিতে একজন পুরুষ এ জাতীয় কাজেও সম্পৃক্ত হতে পারে না।

এমনকি বৈধভাবেও, ইসলাম প্রথম স্ত্রী বাদে একজন পুরুষকে সর্বোচ্চ তিনজন নারীর সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপনের বিষয়টি অনুমোদন দিয়েছে। তবে, কোনো পুরুষ গোপনে এ ধরনের সম্পর্ক করতে পারবে না। তাকে যদি করতেই হয়, তাহলে প্রকাশ্যে এবং বিয়ের চুক্তিপত্রের মাধ্যমেই এ ধরনের শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে। বড় পরিসরে জানানোর সামর্থ্য না থাকলে ছোট পরিসরে লোকজনকে জানাতে হবে।

কিন্তু কাউকে না জানিয়ে এবং বিবাহিত সম্পর্ক ছাড়া একজন পুরুষ কোনো নারীর সঙ্গেই এ জাতীয় কর্মকাণ্ড করতে পারবে না। যারা নারীর অভিভাবক হিসেবে আছেন, তাদেরও দায়িত্ব হলো শারীরিক সম্পর্ক সংক্রান্ত ইসলামের বিধানগুলো সমন্ধে ভালোভাবে জানা এবং একটি পুরুষ ও নারী যদি এ বিধানগুলো মেনেই শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করে, তাহলে তাতে কোনো বাধা না দেয়া।

এ ধরনের সম্পর্কগুলোকে আধুনিক সময়ের প্রচলিত বিয়ে সংক্রান্ত বিশেষ আদালতে নিবন্ধন করে নেয়াও জরুরি। সেই সঙ্গে, ছোট পরিসরে হলেও একটু অনুষ্ঠানের আয়োজন করা যায়, যাতে উভয় পক্ষের পরিচিত কিছু মানুষজন

এসে সমবেত হতে পারেন।

বিয়েটি ভীষণ রকমের মানবিক একটি পন্থা। কেননা, এর মাধ্যমে একজন মানুষ তার গোটা সমাজের বোঝাকে অনেকখানি লাঘব করে। একজন নারী যার কোনো স্বামী নেই, সেই মহিলাটিই বিয়ের পর নিরাপত্তা পায়, সঙ্গী পায়, আশ্রয় পায়।

বিয়েকে মানবিক বলতেই হবে কারণ, বিয়ের মধ্য দিয়েই দুজন মানুষের শারীরিক সম্পর্কটি বৈধতা পায়। বিয়ের বিধিসম্মত প্রথার অংশ হিসেবে একজন স্বামী কনেকে দেনমোহর দেয়, ফার্নিচার উপহার দেয়, অন্যান্য খরচও বহন করে। তাছাড়া বিয়ের সামাজিক ফায়দাও আছে। এর মাধ্যমেই সমাজের ক্ষুদ্রতম একক অর্থাৎ পরিবার সমাজে নতুন নতুন উত্তরাধিকার উপহার দেয়।

বিয়েটি মানবিক একটি পন্থা। কারণ একজন পুরুষ তার বিবাহিত স্ত্রীর সঙ্গে শুধুমাত্র শারীরিক সম্পর্ক স্থাপনের জন্যই দায়ী থাকে না। বরং পাশাপাশি, যখন সেই মহিলা গর্ভবতী হয় এবং নানা ধরনের কষ্ট ভোগ করে, তখন স্বামীকে সেগুলোরও দায়িত্ব নিতে হয়।

কোনো স্বামী তার স্ত্রীকে যাবতীয় কষ্ট ও ভোগান্তি একা একা সহ্য করার জন্য ছেড়ে দিতে পারে না। স্বাভাবিক সময়তো বটেই, গর্ভবতী থাকা অবস্থায়ও কিংবা তার পরবর্তীতে সন্তান প্রসব করার সময়েও একজন নারীর যাবতীয় ভরণপোষণের দায়িত্ব তার স্বামীর।

বিয়ে অত্যন্ত মানবিক একটি সামাজিক ও ধর্মীয় প্রথা কেননা, দুজন মানুষের মধ্যে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপনের ফলে যে সন্তান আসে, বিয়ে তাকেও স্বীকৃতি দেয়। ফলে, সমাজ জানতে পারে যে, এই দুজন মানুষের ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ হিসেবেই এ সন্তানটি পৃথিবীতে এসেছে। পরবর্তীতে, শুধু বিবাহিত দম্পতিই নয় বরং গোটা সমাজই এই নবাগত সন্তানকে নিয়ে তাই গর্ব ও স্বস্তি বোধ করে।

ড. মুস্তফা আল সিবাঈ বহুবিবাহ প্রথা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন, একজন পুরুষ একাধিক বিয়ে করার মাধ্যমে তার কামুকতা ও যৌনবাসনাকে হয়ত অনেক বেশি এবং একাধিক নারীর সঙ্গে উপভোগ করতে পারে ঠিকই, কিন্তু মূলত এর মাধ্যমে সেই পুরুষ তার নিজের ঘাড়ের ওপর বোঝাকে অনেকগুণ বাড়িয়ে নেয়। তার জীবনে সমস্যা এবং দায়িত্বও সীমাহীন বেড়ে যায়।

মুস্তফা আল সিবাঈ-র মন্তব্যটি খুবই যথার্থ ও বাস্তব। তারপরও নিশ্চিতভাবেই বলা

যায়, এই বহুবিবাহ পদ্ধতি না থাকলে আরো নানা ধরনের বিশৃংখলা দেখা দিত। এটা একটি নৈতিক পন্থা যার মাধ্যমে নৈতিকতা ও মানুষের সম্মান সুরক্ষিত হয়।

৯.৫ গণহারে যৌন সম্পর্ক : অনৈতিক ও অমানবিক

পশ্চিমা সমাজে যে অবাধ যৌন সম্পর্ক দৃশ্যমান রয়েছে তার সঙ্গে ইসলামের প্রবর্তিত পদ্ধতি কতটা ভিন্ন? একজন পশ্চিমা লেখক লিখেছেন, যখন পশ্চিমে কোনো লোক মৃত্যুশয্যায় উপনীত হয়, তখন অনেক সময় একজন ধর্মযাজককে তার সামনে নিয়ে আসা হয় যাতে সেই মৃতপ্রায় ব্যক্তি তার অপরাধ স্বীকার করার সুযোগ পায়। এক্ষেত্রে এমন একটি লোকও হয়ত পাওয়া যাবে না যে তার স্ত্রীর বাইরে একাধিক নারীর সঙ্গে যৌন সম্পর্ক স্থাপনের কথা অস্বীকার করবে।

পশ্চিমা জগতে এই অবাধ যৌনাচারগুলো হচ্ছে কোনো ধরনের আইন, বিধান বা প্রথা ছাড়াই। এ কারণে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এ ধরনের শারীরিক সম্পর্কগুলো হচ্ছে বন্ধুত্বের নাম দিয়ে। যাদের সঙ্গে সম্পর্ক করা হয়ে যায়, পুরুষ ব্যক্তি হয়ত পরবর্তীতে তার কোনো খবরই রাখে না। আর যদি যোগাযোগ রাখেও তা হয়ত রক্ষিতা হিসেবে। এ ধরনের অনানুষ্ঠানিক সম্পর্ক দুজন বা চারজনের সঙ্গে নয়, বরং অগণিত মানুষের সঙ্গেই করে থাকে। পরিবার বা অভিভাবকেরাও তাদের সন্তানদের এসব সম্পর্কের কথা জানে না। তারা যা করে, চুপি চুপি একেবারে গোপনেই করে।

তাছাড়া যে ছেলেরা এ ধরনের সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে, তারা ভিকটিম মেয়ের কোনো ধরনের ভরণপোষণের দায়িত্ব নেয় না। বরং মেয়েটির সম্মানকে নষ্ট করে। তাকে ছেড়ে চলে যায়। ফলে মেয়েটি ভীষণ আর্থিক সঙ্কটে পড়ে যায়। আর গর্ভবতী হয়ে পড়লে তো কথাই নেই। মেয়েটি তখন সেই ছেলের কাছ থেকে ন্যূনতম আর্থিক ও মানসিক সমর্থনও পায় না। বাচ্চা হয়ে গেলে সেই ছেলে তাকে নিজের সন্তান হিসেবেও স্বীকৃতি দেয় না। ফলে, সন্তানটি পিতৃপরিচয়হীন একজন অবৈধ সন্তান হিসেবে বড় হতে থাকে। যতদিন এই বাচ্চা বেঁচে থাকে তাকে কলঙ্কের দাগ নিয়েই বেঁচে থাকতে হয়।

এটাকে আপনি আইনী অবাধ যৌনাচার বলতে পারেন, তবে বহুবিবাহ নয়। এ ধরনের বাছবিচারহীন যৌন-সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে কোনো ধরনের নৈতিকতা এবং মানবিক মূল্যবোধ থাকে না। বরং এই অবৈধ যৌনাচারের মধ্য দিয়ে ব্যক্তির কামুকতা এবং স্বার্থপরতাকেই প্রণোদনা দেয়া হয়। কোনো ধরনের দায়িত্বানুভূতি জাগ্রত হয় না। তাহলে বহুবিবাহ আর অবাধ যৌনাচার- এই দুটো প্রথার মধ্যে কোনটি বেশি মানবিক? কোন প্রথায় শুধু কামুক পশুবৃত্তির

চাহিদা মেটানো হয়, আর কোন প্রথায় নারীর সম্মান রক্ষিত হয় এবং মানবিকতার প্রসার ঘটানো হয়, তা সহজেই এখন বিবেচ্য।

৯.৬ বহুবিবাহ প্রথার অপব্যবহার

আমরা অস্বীকার করি না যে, আল্লাহ তাআলা যে কল্যাণকর উদ্দেশ্য পূরণে বহুবিবাহের বিধানটি জারি করেছিলেন, তা অনেক মুসলিমই অনুধাবন করেনি। তাই তারা তালাকের মতো বহুবিবাহ প্রথাটিকেও নিজেদের প্রয়োজনমতো ইচ্ছেমতো ব্যবহার করেছে। এখানে শরীয়া বিধানের কোনো ব্যর্থতা নেই। ব্যর্থতা রয়েছে সেই মুসলিমদের যারা এ বিধানটির অন্তর্নিহিত তাৎপর্য বুঝেনি। যারা আচরণগতভাবে মার্জিত নয় এবং যারা ধর্মের প্রকৃত শিক্ষাকে উপলব্ধি করতে পারেনি, মূলত তারাই এই প্রথাগুলোর অপপ্রয়োগ করছে।

আমরা প্রায়শই দেখতে পাই, একজন পুরুষ একাধিক স্ত্রীর মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করতে পারবে কিনা তা নিশ্চিত না হওয়ার পরও একাধিক বিয়ে করছে। অথচ, একাধিক বিয়ে করার জন্য স্বচ্ছতা ও ভারসাম্য রক্ষাকে আল্লাহ শর্ত হিসেবে নির্ধারণ করে দিয়েছেন। কোনো কোনো পুরুষ ভরণপোষণ দিতে না পারলেও একাধিক বিয়ে করছেন, যা অন্যায়। শুধু তাই নয়, যখন পরিবার বড় হচ্ছে, সন্তান-সন্ততি আসছে তখন এই আর্থিক অসংগতির বোঝা তাদের সবার জীবনকেই আরো বেশি দুর্বিসহ করে দেয়। কোনো কোনো স্বামী হয়ত ভরণপোষণটা ঠিকই দিতে পারে, তবে মোটেও নিরাপত্তা দিতে পারে না।

পারস্পরিক অধিকারগুলো এভাবে ক্রমাগতভাবে ক্ষুণ্ন হয়ে যাওয়ায় পরিবারের শান্তি নষ্ট হয়ে যায়। দেখা যায়, স্বামী তার নতুন স্ত্রীর প্রতি অনেক দরদি হলেও প্রথম স্ত্রীকে অবহেলা করতে শুরু করে। এমনকি প্রথম স্ত্রীর প্রতি স্বামীর কোনো আকর্ষণই থাকে না, এমনও দেখা যায়। এমতাবস্থায় স্বামীর দ্বিতীয় বিয়ের কারণে প্রথম স্ত্রী একেবারেই অনিশ্চয়তার মাঝে পড়ে যায়। না সে বিবাহিত অবস্থায় থাকে, না আবার ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়।

ফলে মাঝখানে ঝুলন্ত অবস্থায় তার দিন কাটতে থাকে। যদি প্রথম স্ত্রীর ঘরে সন্তান থাকে, তারাও তখন তাদের বাবার দ্বিতীয় স্ত্রী ও তার সন্তানদের প্রতি আক্রোশ নিয়ে বড় হতে থাকে। কারণ তারা অনুভব করে যে, তার বাবা তাদের প্রাপ্য নৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকারকে ক্ষুণ্ন করে দ্বিতীয় পক্ষের পরিবারকে বেশি অগ্রাধিকার দিচ্ছে।

এত সব সীমালঙ্ঘন এবং অপব্যবহারের পরেও এ কথা দ্ব্যর্থহীনভাবে বলা যায় যে,

ইসলাম অনুমোদিত বহুবিবাহ প্রথাটি পশ্চিমা দেশগুলোতে বিদ্যমান অবাধ যৌনাচারের চেয়ে বহুগুণে ভালো। অথচ তারা নিজেদেরটাকে সঠিক মনে করে ইসলামের শর্তসাপেক্ষ বহুবিবাহ প্রথাকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করছে। নানা ধরনের অপপ্রচার চালিয়ে ইসলামকে হেয় করার চেষ্টা করছে। তাছাড়া, মুসলিম সমাজগুলোতে আগের মতো আর বহুবিবাহ প্রথা এখন দেখাও যায় না। কারণ, ব্যয়বহুল এই জীবনযাত্রায় এক স্ত্রী এবং একটি পরিবারকে বহন করাই এখন বেশ কষ্টসাধ্য।

৯.৭ বহুবিবাহ বন্ধে পশ্চিমাদের অযাচিত আহ্বান

দুর্ভাগ্যজনকভাবে, আরব ও ইসলামিক দেশগুলোতে অনেকেই পশ্চিমাকরণের পক্ষে অবস্থান নিয়েছেন। তারা সীমা অতিক্রমকারী মুসলিম বিশেষত যারা বহুবিবাহের প্রথাকে অপব্যবহার করেছে তাদের দৃষ্টান্তকে সামনে এনে বহুবিবাহের সমালোচনা করছে এবং এই প্রথাকে সম্পর্ণ বিলুপ্ত করার দাবি তুলেছে। বহুবিবাহের নেতিবাচক পরিণতিগুলোকে বারবার আলোচনায় নিয়ে আসা হচ্ছে আর পরকীয়া ও ব্যভিচারের ক্ষতিকারক দিকগুলোর বিষয়ে রহস্যজনক নীরবতা পালন করা হচ্ছে।

গণমাধ্যম, বিশেষ করে সিনেমা, নাটক প্রভৃতির ভেতর দিয়ে মানুষের মাঝে, বিশেষ করে নারীদের মনে বহুবিবাহের বিষয়ে বিদ্বেষপূর্ণ ধারণা তৈরি করা হচ্ছে। নারীদেরকে উসকানি দেয়া হচ্ছে যাতে তারা স্বামীর ব্যভিচারকে মেনে নেয় কিন্তু দ্বিতীয় বিয়েকে যেন কোনোভাবেই সহ্য না করে।

৯.৯ যে ভিত্তিতে ওরা বহুবিবাহকে খারিজ করে

পশ্চিমা মানসিকতা সম্পন্ন এই মানুষগুলো ইতোমধ্যেই অনেক আরব ও মুসলিম দেশে সফলও হয়েছেন। তাদের ক্রমবর্ধমান চাপ এবং নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টার পরিণতিতে অনেক দেশ এখন আল্লাহর দেয়া বিধানকে বাদ দিয়ে পশ্চিমের দেশগুলোর প্রবর্তিত আইনকে চালু করেছে। এখন অন্য আরো অনেক দেশেই এ দাবির পক্ষে জনমত গড়ে তোলার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

তারা প্রাথমিকভাবে বহুবিবাহকে ইসলামী শরীয়াতের একটি বিধান হিসেবে চিহ্নিত করতে চেষ্টা করে। এরপর তারা পরবর্তী পর্যায়ে গিয়ে প্রমাণ করে যে, কীভাবে এই আইনের মাধ্যমে মানুষের অধিকারগুলোকে নষ্ট করা হয়। মানুষেরা কীভাবে এসব বিধানের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাও তারা বেশ কিছু বাজে দৃষ্টান্তের মাধ্যমে প্রমাণ করার চেষ্টা করে।

ইসলাম এ ধরনের চতুরতাকে অনুমোদন করে না। কেউ কেউ এমনও আছে,

যারা কুরআন ও হাদিসের বার্তাকে বিকৃত করে নিজেদের চিন্তাধারার আলোকে উপস্থাপন করে। অথচ আল কুরআন, একজন পুরুষকে একাধিক বিয়ে করার অনুমতি দিয়েছে তখন, যখন সেই স্বামী নিশ্চিত করতে পারবে যে, সে উভয় স্ত্রীর মধ্যেই সুবিচার ও ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করতে পারবে। যদি কারো মাঝে ভারসাম্য করার বিষয়ে সংশয় বা দ্বিধা থাকে, তাহলে তাকে দ্বিতীয় বিয়ের পথ থেকে সরে আসতে বলা হয়েছে। আল্লাহ সুবহানুতায়ালা আল কুরআনে বলেন :

وَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تُقْسِطُوْا فِي الْيَتٰمٰى فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ مَثْنٰى وَ ثُلٰثَ وَرُبٰعَ ۚ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ؕ ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَلَّا تَعُوْلُوْا ○

আর যদি তোমরা ভয় করো যে, ইয়াতীম মেয়েদের প্রতি সুবিচার করতে পারবে না, তবে সেসব মেয়েদের মধ্যে থেকে যাদের ভালো লাগে তাদের বিয়ে করে নাও দুই, তিন, কিংবা চারটি পর্যন্ত। আর যদি এরূপ আশঙ্কা করো যে, তাদের মধ্যে ন্যায়সঙ্গত আচরণ বজায় রাখতে পারবে না, তবে একটিই অথবা তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসীদেরকে; এতে পক্ষপাতিত্বে জড়িত না হওয়ার অধিকতর সম্ভাবনা বিদ্যমান।
সূরা আন নিসা ৪ : ৩

কুরআন এভাবেই বহুবিবাহের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও ভারসাম্য নিশ্চিত করাকে শর্ত করে দিয়েছে। যদিও একই সূরার পরবর্তী আয়াতে আবার বলা হয়েছে যে, শতভাগ স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। আল্লাহ বলেন :

وَلَنْ تَسْتَطِيْعُوْٓا اَنْ تَعْدِلُوْا بَيْنَ النِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيْلُوْا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوْهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ؕ

তোমরা কখনও নারীদেরকে সমান রাখতে পারবে না, যদিও এর আকাঙ্ক্ষী হও। অতএব, একজনকে দোদুল্যমান অবস্থায় রেখে আরেকজনের দিকে পরোপুরি ঝুঁকে পড়বে না। (তাকে তুলনামূলক বেশি সময় ও গুরুত্ব দিও না)।
সূরা আন নিসা ৪ : ১২৯

এর ভিত্তিতে সেসব পশ্চিমা মানসিকতাসম্পন্ন লোকেরা দাবি করে, দ্বিতীয় এই নির্দেশ দিয়েই কুরআন নিজের এর আগের বিধানকে খারিজ করে দিয়েছে। ঠিক একইভাবে তারা আরো বেশ কিছু অজুহাত ও যুক্তি দাঁড় করায়। আমরা এখন সেসব বিষয়কে নিয়ে আলোচনা করব।

৯.৯ যার মন্দের পরিমাণ ভালোর চেয়ে বেশি তা ইসলাম অনুমোদন করে না

তারা বলছে, বহুবিবাহ প্রথা সমাজ ও পরিবারের জন্য খুবই অকল্যাণকর। অথচ ইসলামি আইন কখনোই অকল্যাণকর কোনো বিষয়কে অনুমোদন দেয় না। ঠিক একইভাবে, মানুষের জন্য উপকারী, এমন কিছুকে ইসলাম নিষিদ্ধও করেনি। আল কুরআনে অত্যন্ত চমকপ্রদভাবে রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দায়িত্ব, তার কাজের দায়িত্ব ও পরিধিকে বিবৃত করেছে। আল্লাহ্ বলেন :

يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَ يَنْهٰهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبٰتِ وَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبٰٓئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ اِصْرَهُمْ وَ الْاَغْلٰلَ الَّتِيْ كَانَتْ عَلَيْهِمْ ؕ فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِهٖ وَعَزَّرُوْهُ وَنَصَرُوْهُ وَ اتَّبَعُوا النُّوْرَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ مَعَهٗٓ ۙ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ○

> তিনি তাদেরকে নির্দেশ দেন সৎকর্মের, নিষেধ করেন অসৎকর্ম থেকে; তাদের জন্য কল্যাণকর বস্তু হালাল করেন ও দূষিত বস্তুসমূহ নিষিদ্ধ করেন এবং তাদের ওপর থেকে ওই বোঝা নামিয়ে দেন এবং বন্দীত্ব অপসারণ করেন যা তাদের উপর বিদ্যমান ছিল। সুতরাং যেসব লোক তাঁর উপর ঈমান এনেছে, তাঁর সাহচর্য অবলম্বন করেছে, তাঁকে সাহায্য করেছে এবং ওই নূরের (আল কুরআন) অনুসরণ করেছে যা তার কাছে অবতীর্ণ করা হয়েছে, শুধুমাত্র তারাই নিজেদের জন্য সফলতা অর্জন করতে পেরেছে।
>
> সূরা আল আরাফ ৭ : ১৫৭

ইসলাম যা কিছু অনুমোদন করেছে তাতে অবশ্যই কল্যাণই নিহিত রয়েছে। অন্তত ক্ষতির চেয়ে উপকার অনেক বেশি রয়েছে। আর ইসলাম যা কিছু নিষিদ্ধ করেছে তাতে শুধুই অকল্যাণ। উপকার যদি কিছু থেকেও থাকে, ক্ষতির পরিমাণ তার তুলনায় অনেক বেশি বলেই ইসলাম নিষিদ্ধ করেছে। এ বিষয়টি বুঝা যায়, মদ ও জুয়া নিষিদ্ধকরণ সংক্রান্ত কুরআনের আয়াত থেকে। আল্লাহ্ বলেন :

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ ؕ قُلْ فِيْهِمَآ اِثْمٌ كَبِيْرٌ وَّ مَنَافِعُ لِلنَّاسِ ۫ وَاِثْمُهُمَآ اَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا

> তারা আপনাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বলে দিন, এদুয়ের মধ্যে

রয়েছে মহাপাপ। আর মানুষের জন্যে উপকারিতাও রয়েছে, আর এগুলোর পাপ উপকারিতা অপেক্ষা অনেক বড়। সূরা আল বাকারা ২: ২১৯

বহুবিবাহ প্রথাকে অনুমোদন দেয়ার নেপথ্যেও ইসলামের একই দৃষ্টিভঙ্গি কাজ করেছে। ইসলাম বহুবিবাহকে অনুমোদন দিয়েছে কারণ এই প্রক্রিয়াটি ভারসাম্য স্থাপন করে। পাপাচারকে সঙ্কুচিত করে। কল্যাণকে নিশ্চিত করে এবং অকল্যাণকে দূরে সরিয়ে রাখে।

ইসলাম একজন ব্যক্তিকে তার খায়েশ বা শারীরিক চাহিদা পূরণ করার সুযোগ দেয় ততক্ষণ অবধি যতক্ষণ সে নিশ্চিতভাবেই স্বচ্ছতা ও ভারসাম্যকে রক্ষা করতে পারবে। যদি তার মধ্যে সুবিচার না করার আশঙ্কা থাকে, অথবা এমন কোনো সম্ভাবনা থাকে যে সে একজনের প্রতি বেশি ঝুঁকে পড়বে, তাহলে তাকে একাধিক বিয়ে না করতে বলা হয়েছে। আল্লাহ্ বলেছেন :

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

আর যদি এরূপ আশঙ্কা করো যে, তাদের মধ্যে ন্যায়সঙ্গত আচরণ বজায় রাখতে পারবে না, তবে একটিই। সূরা আন নিসা ৪ : ৩

প্রথম স্ত্রীর জন্য এটাই সবচেয়ে ভালো হয়, যদি সে একাই স্বামীর ঘর করতে পারে এবং অন্য কারো সঙ্গে তাকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে না হয়। কিন্তু স্বামীর দিকটাও বিবেচনায় রাখতে হবে। যদি সম্ভাবনা থাকে যে, দ্বিতীয় বিয়ে না করলে তিনি অবৈধ শারীরিক সম্পর্কে জড়িয়ে যাবেন অথবা প্রথম স্ত্রী যদি তাকে সন্তান না দিতে পারেন তাহলে স্বামী সন্তানের পিতা হওয়ার জন্যেও একাধিক বিয়ের কথা ভাবতে পারেন।

আবার দ্বিতীয় স্ত্রী হিসেবে যে নারী আসবেন, তারও অধিকার বা স্বার্থ বলে একটা বিষয় থাকতে পারে। তিনিও হয়ত কারো নিকট আশ্রয় বা সুরক্ষা পেতে চান। একজন স্বামীকে অর্ধেকও যদি পায়, যদি অতটুকু নিরাপত্তা পায় তাহলে হয়ত কুমারী হয়ে থাকা, বিধবা বা তালাকপ্রাপ্তা হয়ে বঞ্চিত থাকার তুলনায় একজন নারী উত্তম মনে করবেন। এভাবেই সবার স্বার্থ ও প্রয়োজনকে বিবেচনায় নিতে হবে।

সমাজের দায়িত্ব হলো, নারী ও পুরুষকে আইনগত বিবাহের মাধ্যমে সুরক্ষা দেয়ার চেষ্টা করা। বিয়ের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে নারী ও পুরুষ একে অপরের দায়িত্ব গ্রহণ করবে। অবাধ যৌনাচারকে নিবৃত করে একটি সুষ্ঠু কাঠামোর প্রসার ঘটানো প্রয়োজন সমাজেরই স্বার্থে। বিয়ে বহির্ভূত অন্য সব অবৈধ পন্থায় যে

সন্তান জন্ম নেয় তারা স্বীকৃতি পায় না, নারীদেরকেও রক্ষিতা হয়ে থাকতে হয়। এটা নিতান্তই অমানবিক ও অগ্রহণযোগ্য।

কারণ, বিয়ে বহির্ভূত পন্থায় একজন ব্যক্তির শারীরিক চাহিদা পূরণ হয়, কিন্তু তাকে কোনো দায় নিতে হয় না। ফলে, তার পার্টনার নারীর বা জন্ম নেয়া সন্তানের ভবিষ্যত সুরিক্ষত হয় না। সন্তান তখন পিতৃপরিচয়হীন বন্যপ্রাণীর মতো বড় হতে থাকে। নিজের পরিচয় দেয়ার মতো কোনো পারিবারিক সূত্রও তার থাকে না। এরকম হতভাগ্য সন্তানের জন্ম বা তার বড় হওয়া নিয়ে কোথাও কোনো সুখকর গল্পগাঁথাও রচিত হয় না।

এরকম পরিস্থিতির অনিষ্টকর পরিণতি অনেক যা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার কোনো উপায় নেই। অন্যদিকে, ইসলাম সর্বাগ্রে প্রথম স্ত্রীর অধিকার সংরক্ষণ করেছে। এরপর দ্বিতীয় স্ত্রীর ভরণপোষণ, আবাসন, পোশাকের ব্যয় নির্বাহ করার তাগিদ দিয়েছে। এই ভারসাম্য রক্ষা করাকে ইসলাম বহুবিবাহের ক্ষেত্রে মৌলিক শর্ত হিসেবে নির্ধারণ করে দিয়েছে।

এটা সত্য যে, সব স্বামী আল্লাহ প্রদত্ত ও নির্ধারিত এই ন্যায়বিচারকে মানতে পারেন না। তবে, কারও ব্যর্থতার কারণে ইসলামের একটি নীতিকে আপনি খারিজও করে দিতে পারেন না। এভাবে চিন্তা করলে তো, ধারাবাহিকভাবে আপনি ইসলামের সকল বিধি বিধানকেই নাকচ করতে শুরু করবেন। এক্ষেত্রে তাই, আইনের সুষ্ঠু প্রয়োগ নিশ্চিত করা জরুরি।

৯.১০ অনুমোদিত বিষয়কে প্রতিরোধ করার অধিসীমা

বলা হয়, যে মানুষটি দায়িত্বে আছে সে চাইলে অনুমোদিত আইনের কিছু অংশকে বাতিল বা প্রতিরোধও করতে পারে। এক্ষেত্রে আমাদের বক্তব্য হলো, একজন দায়িত্বশীল বৃহত্তর কল্যাণের স্বার্থে ক্ষেত্রবিশেষে বা বিশেষ কিছু সময়ে বা বিশেষ কিছু ব্যক্তির ক্ষেত্রে অনুমোদিত আইনকে সীমিত পরিসরে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। তবে, ঢালাওভাবে এমনটা করার কোনো সুযোগ নেই। আল্লাহ যাকে অনুমোদন দিয়েছেন, এককথায় তাকে কেউ বাতিল করতে পারবে না। আল্লাহ বলেন :

اِتَّخَذُوْٓا اَحْبَارَهُمْ وَ رُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَ الْمَسِيْحَ ابْنَ
مَرْيَمَ ۚ وَمَآ اُمِرُوْٓا اِلَّا لِيَعْبُدُوْٓا اِلٰـهًا وَّاحِدًا ۚ

তারা (ইহুদি ও খৃস্টানরা) তাদের নিজেদের খেয়ালখুশি মতো চলার জন্য আল্লাহ এবং ঈসা ইবনে মারইয়ামকে বাদ দিয়ে নিজেদের ধর্মের পণ্ডিত ও

সংসারবিরাগীদেরকে তাদের রব রূপে গ্রহণ করেছে। অথচ তারা আদিষ্ট ছিল এক ইলাহ-র ইবাদতের জন্য। সূরা আত তাওবা ৯ : ৩১

হাদিসেও একই বার্তা এসেছে: আদী ইবনে হাতিম রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি গলায় স্বর্ণের ক্রুশ পরে রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সামনে এলাম। তিনি বললেন, হে আদী! তোমার গলা থেকে এই প্রতিমা সরিয়ে ফেলো। এরপর আমি তাঁকে সূরা তাওবার নিম্নোক্ত পাঠ করতে শুনলাম। তারা আল্লাহ তাআলা ব্যতীত তাদের পণ্ডিতকে ও সংসারবিরাগীগণকে তাদের প্রভু বানিয়ে নিয়েছে।

তারপর রসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তারা অবশ্য ওদের পূজা করত না। তবে ওরা কোনো জিনিসকে যখন তাদের জন্য হালাল বলত তখন সেটাকে তারা হালাল বলে মেনে নিত। আবার ওরা কোনো জিনিসকে যখন তাদের জন্য হারাম বলত তখন নিজেদের জন্য সেটাকে হারাম বলে মেনে নিত। তিরমিজি ৩০৯৫

অনুমোদিত বিষয়কে সাময়িক নিয়ন্ত্রণের উদাহরণ দিতে গেলে আমরা কুরবানির পশু জবাইকে কয়েকদিনের জন্য পিছিয়ে দেয়াকে বুঝাতে পারি, যেমনটা উমার রদিয়াল্লাহু আনহুর সময়ে হয়েছিল। কিংবা ধরা যাক, একজন কৃষকের একটি নির্দিষ্ট কৃষিজ পণ্য উৎপাদন অনেক বেশি করার সুযোগ আছে। এটা কোনো অনিয়মও নয়। তারপরও তাকে কিছুদিন সেই সুযোগ থেকে বিরত রাখা যায়, যাতে জমি কিছুটা বিশ্রাম পায় এবং ভিন্ন ধরনের আরো কিছু পুষ্টিকর ফসলও সেখানে উৎপাদন করা যায়।

কিংবা ধরুন, একটি সামরিক বাহিনীর শীর্ষ কর্মকর্তাদের বিদেশি নারীকে বিয়ে করতে কোনো আইনী বাধা নেই। তারপরও এই সামরিক কর্মকর্তাদেরকে সেই সুযোগটি থেকে বঞ্চিত করা হয়। কারণ, সেখানে বাইরের কোনো দেশের কাছে দেশের সামরিক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাচার হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

এগুলো বিশেষ ধরনের বিষয়। কিন্তু আল্লাহ নিজে যে বিধানগুলো প্রবর্তন করেছেন, আর রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে বিধানগুলো অনুসরণ করার দিকনির্দেশনা দিয়ে গেছেন, অথবা আল্লাহ প্রদত্ত নির্দেশনার আলোকে রাষ্ট্র তালাক বা বহুবিবাহ সংক্রান্ত যে বিধানগুলো প্রতিষ্ঠা করেছে সেগুলোকে প্রতিরোধ করা, সীমিত করা বা খারিজ করে দেয়া কখনোই উপর্যুক্ত দৃষ্টান্তগুলোর সঙ্গে মিলবে না।

এবার আসা যাক পরের প্রসঙ্গে। সূরা নিসার ১২৯ নম্বর আয়াত অর্থাৎ তোমরা

কখনও নারীদেরকে সমান রাখতে পারবে না, যদিও এর আকাঙ্ক্ষীও হও। এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বহুবিবাহ বিরোধীরা বলেছে, কুরআনও এটি বলে দিচ্ছে যে, একাধিক স্ত্রীর মাঝে কখনোই সুবিচার করা যায় না।

এই দাবিটি কুরআনের আয়াতের অপব্যাখ্যার শামিল। মূলত, কুরআনের শব্দচয়নগুলোকে এরা নিজেদের মতো করে ব্যাখ্যা করতে চায় এবং প্রমাণ করে যে, রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা বলেছেন বা সাহাবীরা যে মতামতগুলো দিয়েছেন তা সঠিক নয় এবং তারা কুরআনেও এ আয়াতের সঠিক তাৎপর্য বুঝতে পারেননি। নাউজুবিল্লাহ।

অথচ, এ আয়াতের মূল বার্তাটি হলো, আল্লাহ কেবলমাত্র ভারসাম্য এবং সুবিচার প্রতিষ্ঠার শর্তেই বহুবিবাহকে অনুমোদন দিয়েছেন। সুবিচার ও স্বচ্ছতা কতটা জরুরি তা গোটা আয়াতটি পড়লেই বুঝা যায়। আল্লাহ বলেন :

وَلَنْ تَسْتَطِيْعُوْٓا اَنْ تَعْدِلُوْا بَيْنَ النِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيْلُوْا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوْهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ؕ

> তোমরা কখনও নারীদেরকে সমান রাখতে পারবে না, যদিও এর আকাঙ্ক্ষী হও। অতএব, একজনকে দোদুল্যমান অবস্থায় রেখে আরেকজনের দিকে পুরোপুরি ঝুঁকে পড়বে না। দোদুল্যমান অবস্থায় ঝুলিয়েও রেখ না।
>
> সূরা নিসা নিসা ৪ : ১২৯

এটি দিয়ে বুঝানো হয়েছে, দুজন নারীর মাঝে শতভাগ সুবিচার ও ভারসাম্য করা, দুজনের প্রতি একই ধরনের মানসিক আকর্ষণ বোধ করা, কিংবা দুজনের প্রতি সমান যৌন আকর্ষণ বোধ করার বিষয়টি পুরুষের একক নিয়ন্ত্রণাধীন নয়। সে একজন স্ত্রীকে অপরের চেয়ে বেশি ভালোবাসতেও পারে। মানুষের মনকে আল্লাহ নিয়ন্ত্রণ করেন এবং তিনি যেভাবে চান সেভাবেই মন অগ্রসর হয়।

একারণে, এ ধরনের অনুভূতির বাইরেও যেসব দায়িত্ব রয়েছে বিশেষ করে, ভরণ-পোষণ, পোশাক, খাদ্য এবং রাতযাপনের ক্ষেত্রে রসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সকল স্ত্রীর মাঝে সমবন্টন করতেন। তারপরও নিজের মানসিক দুর্বলতার জন্য তিনি সবসময় আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতেন।

> আয়িশা রদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর স্ত্রীদের মাঝে খুবই ন্যায়সঙ্গতভাবে পালাবন্টন করতেন। আর তিনি বলতেন, হে আল্লাহ! আমার সামর্থ্য অনুযায়ী এই

আমার পালা বন্টন। যে ব্যাপারে শুধু আপনারই পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ শক্তি আছে, কিন্তু আমার নেই, সেই ব্যাপারে আমাকে অভিযুক্ত করবেন না।

তিরমিজি ১১৪০

এক্ষেত্রে পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ না থাকা বলতে রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অন্তরের দুর্বলতাকে বুঝিয়েছেন। এটা হলো এমন একটি দুর্বলতা যা আল্লাহ ক্ষমা করে দেবেন বলে আশা করা যায়। কেননা, আল্লাহ কখনো মানুষকে তার সাধ্যের অতিরিক্ত কোনো দুর্বলতার জন্য ভৎর্সনা করেন না। আল্লাহ বলেন :

وَلَنْ تَسْتَطِيْعُوْٓا اَنْ تَعْدِلُوْا بَيْنَ النِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيْلُوْا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوْهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ؕ

তোমরা কখনও নারীদেরকে সমান রাখতে পারবে না, যদিও এর আকাঙ্খা করো। অতএব, একজনকে দোদুল্যমান অবস্থায় রেখে আরেকজনের দিকে পুরোপুরি ঝুঁকে পড়বে না। দোদুল্যমান অবস্থায় ঝুলিয়েও রেখ না।

সূরা আন্ নিসা ৪ : ১২৯

এই সমান না রাখার বিষয়টি বলতে আবেগের দুর্বলতাকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। কারো প্রতি কিঞ্চিৎ দুর্বলতা বেশি বোধ করলে আল্লাহ তা ক্ষমা করবেন। অবাক করা বিষয় হলো, অনেকগুলো আরব দেশ যিনাকে নিষিদ্ধ না করলেও বহুবিবাহ নিষিদ্ধ করেছে। কেবল জোরপূর্বক ধর্ষণ এবং স্ত্রীর বিশ্বাসঘাতকতা বা তার বিরুদ্ধে স্বামীর পরকীয়ার অভিযোগের ক্ষেত্রে একাধিক বিয়ের অনুমতি দেয়া হয়েছে। অথচ ইসলামে যিনা গুরুতর অপরাধ হিসেবে গণ্য। আল্লাহ বলেন :

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰٓى اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً ؕ وَسَآءَ سَبِيْلًا

আর ব্যভিচারের কাছেও যেও না। নিশ্চয় এটা অশ্লীল কাজ এবং মন্দ পথ।

সূরা বনী ইসরাইল ১৭ : ৩২

শায়খ আব্দুল হালিম মাহমুদ রহমাতুল্লাহি আলাইহির কাছ থেকে জেনেছি যে, অনেকগুলো আরব-আফ্রিকান দেশে বহুবিবাহ নিষিদ্ধ থাকলেও সেখানে গোপন চুক্তির মাধ্যমে একাধিক বিয়ে করা যায়। কেউ বহুবিবাহ করলে এবং তা প্রকাশ্যে জানাজানি হলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে শাস্তি দেয়া হয়। তাই তারা একাধিক বিয়ে করলেও বউ এবং বিয়ের কথা দুটোই আড়ালে রাখে।

শায়খ আমাকে এরকমই একজন ব্যক্তির কথা জানিয়েছিলেন যিনি গোপনে তার দ্বিতীয় স্ত্রীর বাসায় যাওয়ার সময় পুলিশ তাকে অনুসরণ করে। এভাবেই পুলিশ তার দ্বিতীয় বিয়ের বিষয়টি নিশ্চিত হয়ে যায়। আইন ভঙ্গ করার অপরাধে এক রাতে দ্বিতীয় স্ত্রীর ঘর থেকে তাকে গ্রেফতার করে আদালতে হাজির করা হয়।

লোকটি অবশ্য বেশ চালাক ছিল। আদালতের প্রশ্নের জবাবে সে উল্টো জানতে চেয়েছিল, আপনাদেরকে কে বলেছে সে আমার স্ত্রী? সে আমার স্ত্রী নয়। সে আমার রক্ষিতা, যার কাছে আমি প্রয়োজনবোধে যাই, সময় কাটাই। এতে আটককারীরা অনুতপ্ত হয়ে বিনয়ের সঙ্গে দুঃখ প্রকাশ করে এবং বলে, এটা নিছক ভুল বুঝাবুঝি। আমরা মনে করেছিলাম সে আপনার স্ত্রী, সে যে রক্ষিতা তা আমরা বুঝিনি। এরপর লোকটিকে ছেড়ে দেয়া হয়।

ওই দেশের আইনে বহুবিবাহ গর্হিত অপরাধ হলেও কেউ তার চাহিদা পূরণের জন্য অন্য কারো সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক রাখলে বা কোনো রক্ষিতা লালন করলে তাতে কোনো দোষ নেই। বরং আইনের চোখে তা ব্যক্তি স্বাধীনতার আওতাভুক্ত।

নারী যখন সমাজের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য

কিছু জ্ঞানপাপী ও একপেশে চিন্তা করা ব্যক্তি নিজেদের ব্যক্তিস্বার্থে প্রচার করে বেড়ায় যে, ইসলাম নারীদেরকে ঘরে বন্দি হয়ে থাকতে বাধ্য করেছে। কবরে যাওয়া ছাড়া মুসলিম নারীদের নিজ ঘর থেকে তাই মুক্তি নেই। অথচ আমরা যদি কুরআন পড়ি, রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হাদিস পড়ি অথবা ইসলামের প্রথম কয়েক শতাব্দীর ইতিহাস পর্যালোচনা করি তাহলে দেখা যায়, এসব কোনো কথাই সত্য নয়।

কুরআন নারী ও পুরুষকে পরস্পরের সহযোগি হিসেবে নির্ধারণ করেছে। ইসলাম তাদের উভয়কেই যার যার অবস্থানের আলোকে কিছু দায়িত্ব প্রদান করেছে। সত্য পথে মানুষকে ডাকার এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখার দায়িত্বও নারী ও পুরুষ উভয়ের। আল কুরআনে আল্লাহ বলেন :

وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۘ يَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَيُطِيْعُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ؕ اُولٰٓئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّٰهُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ○

আর মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী একে অপরের সহায়ক। তারা ভালো কথার শিক্ষা দেয় এবং মন্দ থেকে বিরত রাখে, সলাত প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নির্দেশ অনুযায়ী জীবন যাপন করে। এদেরই উপর আল্লাহ দয়া করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশীল, সুকৌশলী।

সূরা আত তাওবা ৯ : ৭১

এ আয়াতের একটি জলজ্যান্ত উদাহরণ তৈরি হয় দ্বিতীয় খলিফা উমার রদিয়াল্লাহু আনহু-এর সময়। একদিন খলিফা মসজিদের মিম্বারে দাঁড়িয়ে খুতবা দিচ্ছিলেন। সেখানে উপস্থিত এক মহিলা খলিফার সঙ্গে প্রকাশ্যে দ্বিমত করে। খলিফা তার কথা শুনেন এবং তার সঙ্গে একমত পোষণ করেন। শুধু তাই নয়, উমার রদিয়াল্লাহু আনহু প্রকাশ্যে বলেন, আপনি ঠিক বলেছেন, উমার ভুল করেছে।

এই ঘটনাটি ইবনে কাসীর রহমাতুল্লাহি আলাইহি তার লেখায় উল্লেখ করেছেন।

আনাস বিন মালিক রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ

> সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফরয। ইবনে মাজাহ ২২৪

এ বিষয়ে সকল মুহাদ্দিসরা একমত যে, প্রত্যেক মুসলিম বলতে এখানে মুসলিম নারীদের কথাও বলা হয়েছে। নারীদেরও অবশ্যই উপকারী জ্ঞান অর্জন করতে হবে, যা তাকে সংশোধন করবে, তার ইবাদতের মান বৃদ্ধি করবে, তার আচার আচরণকে সংযত করবে এবং যে কোনো অবস্থায় ইসলামের নৈতিকতার সীমানায় থাকতে উদ্বুদ্ধ করবে।

আল্লাহ কোন বিষয়টি অনুমোদন করেছেন, আর কোনটিকে নিষেধ করেছেন, মানুষ হিসেবে তার অধিকার কি, করনীয়ই বা কি, এসব বিষয়ে তার সুস্পষ্ট জ্ঞান থাকা চাই। এমনকি একজন নারী জ্ঞানের উৎকর্ষতা অর্জন করে নিজেদেরকে ইজতিহাদ করার পর্যায়েও উপনীত করতে পারেন। ইসলামের ইতিহাসে এমন দৃষ্টান্তও বিদ্যমান।

একজন স্বামী কোনো অজুহাতেই তার স্ত্রীকে জ্ঞান অর্জনের প্রক্রিয়া থেকে বিরত রাখতে পারেন না। অন্তত যে জ্ঞানটি অর্জন করার জন্য নারীরা আদিষ্ট, তা অবশ্যই নারীদেরকে ধারণ করার সুযোগ দিতে হবে।

যদি কোনো স্বামী এ জ্ঞান দেয়ার বিষয়ে যোগ্য না হন বা নিজেকে সঠিক মনে না করেন, তাহলে সেই জ্ঞানটুকু অর্জনের জন্য স্ত্রীকে বাইরেও যেতে দিতে হবে। উম্মুল মুমিনিনদের মনে যখনি কোনো প্রশ্ন আসত তারা সরাসরি রসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছেই বিষয়টি জানতে চাইতেন। কোনো ধরনের কুপমণ্ডুকতা তাদেরকে বিরত বা সংযত রাখতে পারত না।

জামাতে নামাজ পড়া একজন নারীর জন্য বাধ্যতামূলক করা হয়নি, যেমনটা পুরুষদের বেলায় করা হয়েছে। নারীর বাস্তবতার আলোকে ঘরে সলাত পড়াই তার জন্য সহজতর। তবে যদি কোনো স্ত্রী মসজিদে জামাতে যেতে চায় তাহলে স্বামী তাতে বাধা দিতে পারবে না।

> রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা আল্লাহর বান্দীদেরকে মসজিদে যেতে বাধা দিওনা। মুসলিম

একজন নারী তার নিজের বা সংসারের প্রয়োজনে বাইরে যেতেই পারে। এমনকি বাজারেও যেতে পারে।

> আয়েশা রদিয়াল্লাহু আনহা-এর বড় বোন, প্রখ্যাত মহিলা সাহাবী আসমা বিনতে আবুবকর রদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, মদিনা থেকে অনেকটা দূরে আমার স্বামীর জমি ছিল, যেখানে খেজুরের চাষ হতো। আমি সেখান

> থেকে মাথায় খেজুর বয়ে এনে পুরোটা পথ ধরে হেঁটে মদিনার বাজারে নিয়ে আসতাম। বুখারি এবং আহমাদ

একজন নারী একটি সেনাবাহিনীর সঙ্গে যেতে পারেন। আহতদের সেবা শুশ্রুষা করতে পারেন এবং তার শারীরিক কাঠামো এবং বাস্তবতার আলোকে আরো যতটুকু করা যায়, করতে পারেন। প্রখ্যাত মহিলা আনসার সাহাবী আল রুবাইয়াহ বিনতে মুয়ায়িস রদিয়াল্লাহু আনহা এর একটি বর্ণনা তুলে ধরেন।

> তিনি বলেন, আমরা রসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে যুদ্ধের ময়দানে গিয়েছিলাম। আমরা সেখানে সাহাবীদেরকে পানি সরবরাহ করতাম, আহতদের সেবা করতাম, তাদেরকে সাহায্য করতাম।
> আহমাদ ৬ : ৩৫৮

> উম্মু আতিয়্যাহ রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সাতবার রসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে যুদ্ধে গিয়েছি। আমরা সেখানে খাবার রান্না করতাম, আহতদের সেবা করতাম এবং যারা অসুস্থ হতেন তাদের শুশ্রুষা করতাম। আহমাদ ৬:৪০৭, মুসলিম ১৮১২

এ ধরনের কাজগুলো নারীদের শারীরিক ও মানসিক কাঠামোর সঙ্গেও সঙ্গতিপূর্ণ। কিন্তু ভারী অস্ত্র বহন করা কিংবা সেনাবাহিনীকে নেতৃত্ব দেয়ার মতো বিষয়গুলো তাদের সঙ্গে মেলে না। যদি পরিস্থিতির কারণে তেমন কিছু করতে হয়, তাহলে তা ব্যতিক্রম। তেমন পরিস্থিতি হলে, নারীরা পুরুষদের পাশে থেকেই তাদের সঙ্গে সশস্ত্র যুদ্ধেও অংশ নিতে পারে। হুনাইনের যুদ্ধে উম্মে সুলাইম রদিয়াল্লাহু আনহার অংশগ্রহণ এবং সে বিষয়ে রসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মন্তব্য জানা যায় তার ছেলে আনাস রদিয়াল্লাহু আনহুর বর্ণিত হাদিস থেকে।

> আনাস রদিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, হুনাইনের যুদ্ধে (আমার মা) উম্মে সুলাইমের হাতে খঞ্জর অর্থাৎ দুধারী লম্বা ছুরি দেখে রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে তা সাথে রাখার কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, যদি কাফের সৈন্য আমার নিকটবর্তী হয়, তবে এ দিয়ে আমি তার পেট ফেড়ে ফেলব। জবাব শুনে রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হেসে ফেলেন। মুসলিম ১৮০৯

> রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহ ওয়া সাল্লাম উহুদের যুদ্ধে উম্মে আম্মারাহ রদিয়াল্লাহু আনহার পারফরম্যান্সের ভুয়সী প্রশংসা করেন। তিনি বলেছিলেন, উহুদের দিন ডানে-বামে যেদিকেই নজর দিয়েছি, উম্মে আম্মারাহকেই লড়াই করতে দেখেছি। তাবাকাত ৮ : ৪১৫; সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা ২ : ২৮১

ভণ্ড নবী মূসায়লামাতুল কাজ্জাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধেও মহিয়ষী এ নারী সাহসিকতার সঙ্গে যুদ্ধ করেন। যুদ্ধ শেষে দেখা যায় তার গোটা শরীরে দশটি ছুরিকাঘাতের চিহ্ন রয়েছে, অথচ তিনি বিষয়টি টেরই পাননি।

যদি অতীতের কোনো যুগে এমন দৃশ্য দেখা যায় যে, নারীরা জ্ঞান অর্জনের সুযোগ পাচ্ছেন না, তারা সব কিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আসবাবপত্রের মতো ঘরে বন্দি হয়ে আছে, তাদের স্বামী তাদেরকে কিছু শেখাচ্ছে না, আবার তারা বাইরে গিয়েও কিছু জানার সুযোগ পাচ্ছে না, নারীদের মসজিদে যাওয়াও বন্ধ করে দেয়া হয়েছে, তাহলে বুঝতে হবে সেই সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের অজ্ঞতা, ইসলাম থেকে বিচ্যুতি এবং প্রান্তিক মনোভাবের কারণেই এমনটা হয়েছে। ইসলাম কখনোই এ জাতীয় অযাচিত পরিস্থিতির দায় নিবে না।

আবার বর্তমানে যেমন উদারতার নামে ইসলামী বিধানের অতিরঞ্জন করা হচ্ছে তাও গ্রহণযোগ্য নয়। ইসলামের প্রকৃত দৃষ্টিভঙ্গি খুবই ভারসাম্যপূর্ণ। ইসলামের প্রতিটি আইন ও বিধানেই এর মানবিকতা ও নৈতিকতার বিষয়টি ফুটে ওঠে। ইসলামে কট্টরপন্থী এবং অতিরঞ্জন বা বাড়াবাড়ি কোনোটারই অস্তিত্ব নেই। আবার ইসলাম একজনের অধিকার দিতে গিয়ে অন্যকে অধিকার থেকে বঞ্চিতও করে না। একটি দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে অপর দায়িত্ব থেকে অব্যাহতিও দেয় না।

এ কারণে, পুরুষদেরকে ঠকিয়ে নারীদেরকে বাড়তি সুবিধা দেয়ার দৃষ্টিভঙ্গি ইসলাম অনুমোদন করে না। আবার একইসঙ্গে, নারীদেরকেও অমর্যাদা করতে চায় না। ইসলাম যেমন নারীকে তার খেয়াল খুশিমতো চলতে দিতে চায় না, ঠিক একইভাবে পুরুষরা যেন নারীর দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তাদেরকে হেয় না করে তাও ইসলাম নিশ্চিত করতে চায়। নারীদের বিষয়ে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি অনেকটা নিম্নরূপ :

১. আল্লাহ যেভাবে, যে কাঠামোতে নারীদের সৃষ্টি করেছেন ইসলাম তা সংরক্ষণ করতে চায়। ইসলাম নারীদেরকে নেকড়েরূপী পুরুষদের পাশবিকতা থেকে হেফাজত করতে চায়। নারীত্বের অপব্যবহার এবং অবৈধ প্রবৃত্তিকে ইসলাম অনুমোদন দেয় না। যেসব পুরুষ নারীদেরকে পণ্য বানিয়ে ফায়দা হাসিল করতে চায়, ইসলাম সেসব লোভাতুর পুরুষের শকুন দৃষ্টি থেকেও নারীকে মুক্ত রাখার চেষ্টা করে।

২. আল্লাহ নারীদের জন্য যে কাজগুলোকে বাছাই করেছেন, সেসব কার্যক্রমকে ইসলাম সমীহ করে। আল্লাহ নারীদের জন্য পুরুষদের তুলনায় বেশি মানবিকতা, সহানুভূতি, স্নেহ ও মর্যাদা পাওয়ার ব্যবস্থা

করেছেন। আল্লাহ নারীদেরকে মাতৃত্বের সম্মান দিয়েছেন। নারীর অসাধারণ বৈশিষ্ট্যের জন্য সমাজ ও সভ্যতা টিকে আছে। গোটা মানবজাতির বংশ পরম্পরা ও উত্তরাধিকার ধারণ করার দায়িত্ব আছে শুধুমাত্র নারীদের ওপর।

ইসলাম নারীদের জন্য ঘরকেই সর্বোত্তম প্রাসাদ হিসেবে বিবেচনা করেছে। একজন নারীই ঘরের প্রধান, ঘরের সংরক্ষক এবং তত্ত্বাবধায়ক। একজন নারী একজন পুরুষের স্ত্রী, সঙ্গী, তার নিঃসঙ্গ সময়ের সাথী এবং সন্তানের মা। ইসলাম মনে করছে, নারীর প্রধান কাজ হলো তার বাসাবাড়ির রক্ষণাবেক্ষণ করা, স্বামীর বিষয়াদির প্রতি খেয়াল রাখা, সন্তানদেরকে ভালোভাবে প্রতিপালন করা, তাদেরকে ইবাদত শেখানো এবং আল্লাহর পথে সংগ্রাম করার জন্য উদ্বুদ্ধ করা। এ কারণে, ইসলাম এমন সব কাজকে অগ্রাহ্য করে যা নারীদেরকে এ কাজগুলো করা থেকে বিরত রাখে। বাসা-বাড়ির দায়িত্ব থেকে নারীদেরকে শারীরিক ও মানসিকভাবে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে বা পরিবারের কাঠামোকে ধ্বংস করে দেয়, এমন কোনো কাজকেই ইসলাম অনুমোদন করে না।

যে কাজগুলো নারীদেরকে তার সাম্রাজ্য থেকে বের করে নিয়ে যায়, স্বামী ও সন্তান থেকে দূরে নিয়ে যায় তা কখনোই ইসলামে স্বীকৃতি পায় না। নারীদের স্বাধীনতা, কর্মজীবন ও বৈষয়িক মর্যাদা দেয়ার কথা যারা বলছে, তারা মূলত নারীদের জীবন থেকে সবকিছুকেই কেড়ে নিচ্ছে কিন্তু বিনিময়ে দিচ্ছে না তেমন কিছুই। আর ইসলাম এসব কর্মকৌশলকে তাই বৈধতা দেয় না।

৩. ইসলাম মনে করে একটি সুখী ও সুন্দর সমাজের ভিত্তিই হলো সুখী পরিবার। আর সুখী পরিবার প্রতিষ্ঠিত হয় আস্থা ও নিশ্চয়তার ওপর ভিত্তি করে। সন্দেহ ও সংশয়ের ওপর কোনো পরিবার টিকে থাকতে পারে না। যে পরিবারের স্বামী-স্ত্রী একে অপরকে সন্দেহ করে, তাদের ভয় ও সন্দেহ চূড়ান্ত পরিণতিতে গোটা পরিবারকেই ধ্বংসের মুখে এনে দাঁড় করায়। পরিবারের সদস্যদের জন্যেও তাদের বাসাবাড়ি তখন জাহান্নাম হয়ে যায়।

৪. ইসলাম অবশ্যই নারীদেরকে ঘরের বাইরের যে কোনো কাজে বা চাকরিতে সম্পৃক্ত হওয়ার সুযোগ দিয়েছে সত্য কিন্তু যে কোনো কাজ করার অনুমতি দেয়নি। সে যে কাজটি করবে তা হতে হবে তার স্বভাব প্রকৃতি, তার নিজস্ব বিষয়াবলী এবং তার সক্ষমতার আলোকে। এমন কোনো কাজে যুক্ত হওয়া যাবে না যা একজন নারীর নারীত্বকেই ক্ষতিগ্রস্ত

করে দেয়। একজন নারীর চাকরি করার বিষয়টি কতগুলো সীমানা ও শর্তের আলোকেই নির্ধারিত হয়। বিশেষ করে, যখন একজন নারীর নিজের জন্য বা তার পরিবারের জন্য বাইরে কাজ করার প্রয়োজন পড়ে কিংবা নারীর যদি এমন কোনো যোগ্যতা থাকে, যা সমাজের জন্যও প্রয়োজন, তাহলে তার বাইরের কাজ করার সুযোগ আছে। শুধুমাত্র অর্থ উপার্জনের জন্য চাকরি করাটা যেন মুখ্য না হয়ে যায়। যেমন, একজন অবিবাহিত নারীকে তার মানসিক স্বস্তির জন্য চাকরি করতে হতে পারে।

আবার একজন বিবাহিত নারী, তার হয়ত বিয়ে হয়েছে অনেক বছর কিন্তু সন্তান নেই্ তিনিও মানসিক প্রশান্তির জন্য বাইরে কাজ করতে পারবেন। অথবা কোনো নারীর যদি হাতে অনেক সময় থাকে এবং তিনি যদি তাতে একঘেয়েমি অনুভব করেন, সেক্ষেত্রে তিনি চাকরি করার কথা ভাবতে পারেন।

যেসব মানুষ নারীদের কাজ-কর্ম বা চাকরির ক্ষেত্রে কোরো শর্ত বা সীমানা মানতে চায় না, তারা উপর্যুক্ত কোনো বাস্তবতাকেই আসলে বিবেচনায় নেয় না। আমরা পরবর্তিতে এ বিষয়টি নিয়ে আরেকটু আলোচনা করব।

১০.১ নারীর কাজকর্মের বিষয়ে অতিরঞ্জন ও বিভ্রান্তি

বুদ্ধিবৃত্তিক দেউলিয়া যেভাবে ব্যক্তিবর্গ অথবা যে জ্ঞানপাপীরা প্রতিনিয়তই নারী ও পুরুষের অবাধ মেলামেশার পক্ষে মতামত দেয় কিংবা এ দুই লিঙ্গের মানুষের মাঝে সব ধরনের প্রতিবন্ধকতা সরিয়ে দেয়ার কথা বলে, তারা নারীদেরকে যেকোনো ধরনের চাকরিতেই সম্পৃক্ত করার কথা বলে। তার সেই চাকরির প্রয়োজন থাকুক না বা না থাকুক। কিংবা সমাজে সেই নারীর অবদান বা কাজের কোনো প্রয়োজন হোক বা না হোক, তাতে তাদের কিছুই যায় আসে না। তারা শুধু অবাধ মেলামেশার পক্ষেই কথা বলে, তা যেকোনোভাবেই হোক না কেন। শর্তসাপেক্ষে নারীদের কাজের বিষয়টিকে তারা অবিচার এবং মধ্যযুগীয় বর্বরতা হিসেবেও অভিহিত করে।

এ জাতীয় চিন্তা যারা করেন তাদের ধূর্ততা হলো এই যে, তারা স্পষ্ট করে নিজেদের উদ্দেশ্যের কথা বলে না। নারীদেরকে নানাভাবে তাদের স্বভাব ও প্রকৃতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করানোর যে চক্রান্ত তারা করছে তাও তারা খোলাসা করে না। নারীদের নারীত্ব বা সৌন্দর্যকে কীভাবে শারীরিক তৃপ্তি বা কামুকতা নিবারণের জন্য ব্যবহার করা হয় তাও তারা আড়াল করে যায়। তারা নিজেদেরকে শুদ্ধ মানুষ হিসেবে উপস্থাপন করে এবং দাবি করে যে, সমাজের

সকলের উন্নতি ছাড়া তাদের মাথায় ভিন্ন কোনো চিন্তা বা উদ্দেশ্য নেই। নারীদেরকে যেকোনো কাজে যুক্ত হতে দেয়ার যে দাবি, তার পেছনে কিছু এলোমেলো যুক্তি আছে। যেমন :

১. তারা দাবী করে, পশ্চিমা বিশ্ব, যারা সভ্যতার বিচারে আমাদের থেকে এগিয়ে, তারা এতটা অগ্রসর হয়েছে মহিলাদেরকে কাজে লাগানোর জন্যই। যদি আমরা পশ্চিমাদের মতো অগ্রসর হতে চাই, তাহলে আমাদেরকেও তাদের কৌশল অবলম্বন করতে হবে। সভ্যতার উপকারিতাকে সকলের জন্য উন্মুক্ত করে দিতে হবে।

২. নারীরা সমাজের অর্ধেক। যদি সমাজের অর্ধেক জনগোষ্ঠী কাজ না করে ঘরে বসে থাকে, তাহলে বিরাট সংখ্যক মানুষের কর্মক্ষমতার অপচয় ঘটবে। ফলে জাতীয় অর্থনীতিও ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তাই সমাজের স্বার্থেই নারীদেরকে কাজ করতে দেয়া উচিৎ।

৩. পরিবারের স্বার্থেও নারীদেরকে কাজ করতে দেয়া উচিৎ। কেননা, বর্তমান সময়ে পরিবার চালানোর ব্যয় অনেক বেড়ে গেছে। নারীরা কাজ করলে পরিবারে আয়-উপার্জন বৃদ্ধি পাবে এবং পুরুষদের বোঝাও তাতে লাঘব হবে।

৪. নিজেদের জন্যই নারীদের কাজ করা উচিৎ। বাসার বাইরে সমাজের নানা ধরনের মানুষের সংস্পর্শে এলে একজন নারীর ব্যক্তিত্ব বিকশিত হবে, তার অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ হবে। ঘরে থেকে এগুলো কখনোই হবে না।

৫. পাশাপাশি, কাজ করলে একজন নারীর প্রতিকূল অবস্থায় একটি অবলম্বন পাবে। নারীর পিতা মারা যেতে পারে, তার স্বামী তাকে তালাক দিতে পারে, অথবা তার সন্তানও তাকে ছেড়ে চলে যেতে পারে। একজন নারী যদি কর্মজীবী হয় তাহলে তেমন পরিস্থিতি হলেও সে দারিদ্রের কষাঘাতে জর্জরিত হবে না।

   সবচেয়ে বড় কথা, আমরা এখন এমন একটি সময়ে আছি, যখন সবাই স্বার্থের জালে বন্দি, সকলের মাঝেই অকৃতজ্ঞতার চর্চা। রক্তের সম্পর্কও এখন আর তেমন কার্যকরী নয়। তাই নিজের ব্যবস্থা নিজের করার মাঝেই এখন কল্যাণ।

১০.২ ভ্রান্ত যুক্তি ও ধারণার জবাব

পশ্চিমারা যেসব যুক্তি এনে আমাদের সামনে দাঁড় করিয়েছে তার অধিকাংশই মিথ্যা ও বিভ্রান্তিকর। এর কারণগুলো নিম্নরূপ :

১. অনুসরণ করার জন্য পশ্চিমারা কখনোই কোনো ভালো দৃষ্টান্ত নয়। আমরা আল্লাহর মুত্তাকী বান্দাদেরকে অনুসরণ করার জন্য দায়বদ্ধ, কোনো পশ্চিমা দর্শন, ব্যক্তি বা চিন্তাধারাকে নয়। আল্লাহ্ বলেছেন :

لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ ○

তোমাদের কর্ম ও কর্মফল তোমাদের জন্যে এবং আমার কর্ম ও কর্মফল আমার আমার জন্যে। সূরা আল কাফিরুন ১০৯ : ৬

২. পশ্চিমা দেশগুলোতে নারীদেরকে কারখানা বা স্টোরের মতো জায়গা গুলোতে যেতে বাধ্য করা হয়। নারীদেরকে তাদের পছন্দমতো কাজ বেছে নেয়ার সুযোগ দেয়া হয় না। তাকে খাদ্য যোগাড়ের জন্য বেরিয়ে যেতে হয় এবং উপার্জনের পথকে বেছে নিতে হয়। এ জন্য যে, হয়ত তার স্বামী তার সঙ্গে নেই বা তাকে ছেড়ে চলে গেছে। সেখানকার সমাজ ব্যবস্থা এতটাই অমানবিক যে, পুরুষগুলো তাদের স্ত্রী বা সঙ্গীনীদেরকে কাঠখোট্টা সমাজের হাতে ছেড়ে দিতে দ্বিধা করে না। এ পুরুষগুলো হয়ত আর এ অবলা নারীদের প্রতি কোনো সহানুভূতিও অনুভব করে না।

ইসলামি শরীয়াতে আল্লাহ ভরণপোষণের জন্য আইন তৈরী করে দিয়েছে। ইসলামের বিধান অনুযায়ী নারীদেরকে এ জাতীয় কার্যক্রমে যুক্ত হওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। কেননা, ইসলামে ভরণপোষণের দায়িত্ব নারীদেরকে দেয়াই হয়নি।

অধ্যাপক মুহাম্মাদ ইউসেফ মূসা তার 'ইসলাম এন্ড হিউম্যানিটিজ নিড অব ইট' শীর্ষক বইতে পারিবারিক কাঠামো সংরক্ষণ করার বিষয়ে ইসলামের অবস্থানকে তুলে ধরতে গিয়ে বলেন :

এটা উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক হবে যে, ফ্রান্সে থাকার সময় আমি একটি পরিবারের সঙ্গে থাকতাম। সেই বাসায় যিনি গৃহ পরিচারিকার কাজ করতেন তাকে বাহ্যত দেখে খুব ভালো পরিবারের বলেই মনে হয়েছিল। তাই তার ইতিহাস জানার জন্য আমি কৌতুহলী হয়ে উঠলাম।

কারণ, কেন এ ধরনের একজন মানুষ অপরের বাসায় ঝি বা পরিচারিকার কাজ করে তা জানতে আমি ব্যাকুল ছিলাম। আমি যে পরিবারের সঙ্গে থাকতাম একদিন তার গৃহকর্ত্রীর কাছে জানতে চাইলাম, ওকে দেখেতো ভালো পরিবারের বলেই মনে হয়, তাহলে কেন এসব কাজ করতে এসেছে? তার কি কোনো আত্মীয় নেই যে তাকে সাহায্য করে এ অবস্থা

থেকে মুক্তি দিতে পারে?

গৃহকর্ত্রী আমাকে উত্তর দিলেন, গৃহপরিচারিকার খুব ধনী একজন চাচা আছে। কিন্তু সে তার ভাতিজির কোনো খবর নেয় না। আমি তখন বললাম, তাহলেতো গৃহপরিচারিকার উচিত তার বড়লোক চাচার বিরুদ্ধে মামলা করা। আমার কথা শুনে সেই গৃহকর্ত্রী বিস্মিত হলেন। তিনি বললেন, ফ্রান্সের বিদ্যমান আইনে এ জাতীয় কোনো মামলা করার কোনো সুযোগ নেই।

যখন সে জানতে পারল যে, ইসলামে এ ধরনের সম্ভ্রান্ত চাচাদের জন্য তার ভাতিজিদের দেখাশুনাকে বাধ্যতামূলক করে দিয়েছে। শুধু ভাতিজি নয়, একজন স্বচ্ছল ব্যক্তির দায়িত্ব হলো তার সকল অস্বচ্ছল আত্মীয়দেরকে সহযোগিতা করা। এ তথ্য পাওয়ার পর ফ্রেঞ্চ সেই মহিলা বলল, তাহলেতো ইসলামের এ বিধান মানুষের জন্য অনেক বড় একটি নেয়ামত। আর এ বিধান সব দেশেই কার্যকর হওয়া দরকার তাহলে কর্মস্থলে যৌন হয়রানি ও নির্যাতনের হাত থেকে অনেক নারীই সুরক্ষা পাবে।

এ মহিলার কথায় আমি বুঝতে পারলাম যে, মূলত ক্ষুধা ও অর্থকষ্টের কারণেই অসংখ্য নারী এ ধরনের কাজে সম্পৃক্ত হয়। ভালো না লাগলেও এ কাজগুলো তাদের জন্য প্রয়োজনীয় বলেই নির্ধারিত হয়। তাই তারা চাইলেও সহজে আর কাজগুলোকে অগ্রাহ্য করতে পারে না।

৩. পশ্চিমারা এতদিনে এমন একটি কাঠামো নির্মাণ করেছে যার আওতায় নারীদের কাজ এবং এর পরিণতি নিয়ে তাদের নিজেদেরই অভিযোগের অন্ত নেই। নারীরাও ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীগতভাবে নিজেদের বিড়ম্বনার কথা তুলে ধরছে এবং বলছে, তাদের হাতে কোনো বিকল্প না থাকায় তারা এ জাতীয় কাজ করছেন। প্রখ্যাত লেখিকা অ্যানা রোডি 'ইস্টার্ন মালি' পত্রিকায় এ প্রসঙ্গে লিখেন :

যদি আমাদের মেয়েরা বাড়িতে কাজের মেয়ের মতো থাকে, তাও তা কোনো ল্যাবরেটরিতে কাজ করে রোগাক্রান্ত হওয়ার চেয়ে বা নানা ধরনের প্রতিকূলতায় চেহারার লাবণ্য হারানোর চেয়ে ভালো। আমার মাঝে মাঝে আফসোস হয়। আমাদের দেশগুলো মুসলিম দেশ হলে কতই না ভালো হতো! মুসলিম দেশগুলোতে যারা বাসায় কাজ করে তারাও এর চেয়ে ভালো সতীত্ব বজায় রেখে কাজ করতে পারে। অনেক মুসলিম পরিবারে ক্রীতদাসিরা বাড়ির মেয়ের মতোই ভালোবাসা পায়, সম্মান পায়।

এটা খুবই লজ্জাজনক যে, ইংরেজরা আমাদের মেয়েদেরকে পণ্য বানিয়েছে। অবাধ মেলামেশার সুযোগ দিয়ে তাদেরকে অসম্মানিত করেছে। তাহলে একজন নারীর ভেতর তার বাসার সঙ্গে যে স্বভাবজাত সখ্যতা, তাকে আমরা কেন অস্বীকার করছি? আমরা পুরুষদের কাজগুলোকে মেয়েদের ওপর চাপিয়ে যেভাবে তাদের সম্মান বৃদ্ধি করতে চাইছি তা কি আদৌ সঠিক? আল ইসলাম ওয়াল জিনস, লেখক ফাথি ইয়াকান

৪. একজন নারীকে তার বাসাবাড়ির দায়িত্ব থেকে সরিয়ে প্রকৌশলী, আইনজীবী বা বিচারক বা কারখানার শ্রমিক বানিয়ে সমাজের খুব লাভ হচ্ছে বলে মনে হয় না। বরং এর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট নারীর অধিকার ও স্বার্থ সংরক্ষিত হয়। কেননা এ জাতীয় কাজ করার মাধ্যমে একজন নারী যে বিষয়ে তিনি দক্ষতা অর্জন করেছেন তা প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে তিনি একটি সুযোগ পান। তবে বিবাহিত জীবন বা মাতৃত্বও কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়।

এ সত্ত্বেও একজন নারী তার নিজের চাহিদা মেটানোর জন্য স্টোরে, ঝুকিপূর্ণ গবেষণাগারে এবং অন্যান্য কর্মস্থলে কাজ করে যান। নেপোলিয়ন একবার তার সেনাদেরকে প্রশ্ন করেছিলেন, তোমরা কি জানো যে, কোন দুর্গটিকে মোটেই জয় করা যায় না। এটা হলো একটি উত্তম মা এবং তার হাতে গড়া দুর্গ। এই কথার মাধ্যমে তিনি আদর্শ মা ও তার সন্তানের কথা বুঝিয়েছেন।

অনেকেই গৃহিনীর কাজটিকে অবমূল্যায়ন করেন। অথচ, সমাজ ও পরিবারের জন্য এর চেয়ে উত্তম কোনো কাজ হয় না। একইসঙ্গে বাসাবাড়ি ও সন্তান সামলানো খুবই কঠিন ও চ্যালেঞ্জিং একটি দায়িত্ব। একজন নারীকে তার সংসার পরিচালনা করার জন্য তাকে অসম্ভব শারীরিক পরিশ্রম করতে হয়।

সন্তানদেরকে মানুষ করতে হয় যাতে তারা দেশের জন্য সৃজনশীল ভূমিকা পালন করতে পারে। সংসার সামলানোর পরও যদি গৃহিনীদের হাতে কোনো সময় থাকে তাহলে হয়ত তারা সেলাইয়ের কাজ করেন। কিংবা আশপাশের অন্যান্য নারীদের সঙ্গে মিলে গঠনমূলক কোনো আলোচনা বা কাজও করতে পারেন। অনেক গৃহিনী এভাবে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করার মাধ্যমে সমাজ থেকে দারিদ্র, অশিক্ষা এবং নানা ধরনের অনাচার দূরীকরণেও অবদান রেখেছেন।

অনেক কর্মজীবী নারী আবার নিজেদের কাজের সুবিধার্থে তার সন্তানদের দেখভাল করার জন্য আলাদা আয়া নিয়োগ করেন। এতে বুঝা যায়,

সংসার সামলানোর জন্য একজন নারীর প্রয়োজন আছে। কিন্তু গৃহকর্ত্রী বাড়ির কাজের থেকে বাইরের কাজকে অধিক গুরুত্ব দেয়ায় নিজে বাইরের কাজকে বেছে নিয়েছেন আর ঘরের কাজ করার জন্য বাইরের লোককে দায়িত্ব দিয়ে রেখেছেন। অথচ বাইরের এ মানুষটির ভাষা, সংস্কৃতি, স্বভাব, আচরণ বা অভ্যাস হয়ত পরিবারের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়।

মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে এখন এ দৃশ্য দেখা যাচ্ছে। গৃহকর্ত্রীরা হয়ত চাকরি বা শপিং করে বেড়াচ্ছে আর দূর প্রাচ্যের কোনো দরিদ্র দেশ থেকে তারা বাচ্চাকে দেখাশুনা করার জন্য আয়া বা বুয়া ভাড়া করে নিয়ে আসছে। এ ধরনের পরিস্থিতির পরিণতি কখনোই ভালো হয় না, যা সবাইকেই নির্মমভাবে ভোগ করতে হয়।

৫. পরিবারের সুখ শান্তি শুধুমাত্র উপার্জনের ওপর নির্ভর করে না। অনেকেই বলে তারা বেশি আয় করেন বলে তারা ভালো ভালো পোশাক কিনতে পারেন। যেহেতু এখন নারী ও পুরুষের অবাধ মেলামেশার সময়। তাই ভালো এবং ফ্যাশন অনুযায়ী পোশাক পরিধান করাকেও তারা বেশ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করেন। অথচ এ আপাত বিষয়গুলোকে ঠিক রাখতে গিয়ে পরিবারের শান্তি ও একে অপরকে সাহচর্য দেয়ার বিষয়টিকে আমরা দিব্যি অগ্রাহ্য করে যাচ্ছি।

অথচ একটি পরিবারের এ বিষয়টি নির্ধারণ করেন সেই বাড়ির গৃহকর্ত্রীরাই। কর্মজীবী নারী সাধারণত খুব ক্লান্ত থাকেন, তার মেজাজ নানা কারণে খিটখিটে হয়ে থাকায় খুব চটজলদি তার রাগ জমে যায়। তাই যতটা প্রয়োজন সেই অনুযায়ী তিনি সংসারে অবদানও রাখতে পারেন না।

৬. একজন নারীকে যদি তার স্বভাবজাত বিষয়ের বাইরে জোর করে নিয়ে আসা হয় এবং তাকে যদি পুরুষের কাজ করতে বলা হয় তাতে তার কোনো কল্যাণ আসতে পারে না। আল্লাহ্ একজন নারীকে নারী হিসেবেই পাঠিয়েছেন।

পুরুষের কাজ করলে তার সৌন্দর্য ও লাবণ্য ক্রমান্বয়ে নষ্ট হয়ে যায়। একজন নারী তখন নারীত্ব বিসর্জন দিয়ে এমন একটি কাঠামোতে যায় ফলে বাধ্য হয়েই তাকে ইংরেজ লেখক-লেখিকারা তৃতীয় লিঙ্গ হিসেবে অভিহিত করতে শুরু করে। নৈতিকতা সম্পন্ন অনেক নারীর এই চিন্তাধারার সঙ্গে একমত পোষণ করেছেন।

৭. আরেকটি বিষয় হলো, পশ্চিমে যা চলবে তা একটি ইসলামি দেশে মুসলিম

কোনো নারীর বেলায় প্রযোজ্য হবে না। ইসলামে একজন নারীকে নানাভাবে নিরাপত্তা দেয়া হয়েছে। একজন পিতাকে তার মেয়ের, একজন ভাইকে তার বোনের, একজন স্বামীকে তার স্ত্রীর এবং একজন সন্তানকে তার মায়ের প্রতি দায়িত্বকে ইসলাম নির্ধারণ করে দিয়েছে।
এখন যদি আমরা এগুলোকে পাশ কাটিয়ে পশ্চিমা দৃষ্টিভঙ্গিকে লালন করতে শুরু করি, তাহলে হয়ত আমাদের এখানে ভাইয়েরাও একইভাবে বোনের প্রতি দায়িত্ব পালনে অস্বীকার করবে, পুরুষ আত্মীয়রাও তাদের মহিলা আত্মীয়দেরকে অগ্রাহ্য করতে শুরু করবে।

তাই আমাদেরকে সর্বাবস্থায় আল্লাহর নির্ধারিত বিধান পালনেই সচেষ্ট থাকা প্রয়োজন। ধর্মীয় বিধানকে কখনোই দুনিয়াবি দৃষ্টিভঙ্গিতে উচিত নয়, দুনিয়াবি ট্রেন্ডকে ধর্মের অনুশীলনের চেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয়ারও কোনো সুযোগ নেই।

নারীরা বিশেষ প্রয়োজনে পুরুষদের জন্য নির্ধারিত কাজে সম্পৃক্ত হতে পারে। কিন্তু যখন বাছবিচারহীনভাবেই তারা এ জাতীয় বিপরীত ধারার কাজে যুক্ত হয়, তখন এর বেশ কিছু ক্ষতিকর প্রভাবও পড়তে পারে। যেমন :

১. এ ধরনের কাজে সম্পৃক্ততা ব্যক্তিগতভাবে নারীর জন্য ক্ষতি বয়ে আনে। কেননা, এর ফলে নারী তার নারীত্ব ও স্বাভাবিক সহজাত বৈশিষ্ট্যগুলো হারিয়ে ফেলে। নারী তখন তার সংসার ও সন্তানকেও তাদের প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করে। এসব কাজ করতে গিয়ে নারী অনেক সময় তার বেশভূষা উন্মুক্ত করে দেয়। ফলে তাদের অবয়ব হয়ে যায় অনেকটা তৃতীয় লিঙ্গের মতো। নারী বা পুরুষের কোনোটার মাঝেই সে নিজেকে আর ধরে রাখতে পারে না।

২. একজন স্বামীর জন্য নারীদের এহেন কাজে সম্পৃক্ততা কল্যাণকর নয়। কারণ তিনি তার স্ত্রীর কাছ থেকে যে ধরনের উপভোগ্য সান্নিধ্য প্রত্যাশা করেন তা থেকেও তিনি বঞ্চিত হন। নারীরা বাসায় আসলেও তখন অফিসের নানা ঝামেলা, সহকর্মীদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা বা পারস্পরিক প্রতিহিংসার কথাগুলো নিয়ে আলোচনা করেন। ফলে, স্বামী তা ভালোভাবে নেয় না। স্ত্রীর অফিসের নানা ধরনের কর্মকাণ্ড ও ভূমিকা অনেকক্ষেত্রে স্বামীর মনে হিংসার বীজও বুনে দিতে পারে, যা তাদের দাম্পত্য সম্পর্ককে ক্ষতিগ্রস্ত করে দেয়।

৩. সন্তানরাও এর নেতিবাচক প্রভাবের শিকার হয়। তারা মায়ের আবেগ,

সহানুভূতি এবং নজরদারি থেকে বঞ্চিত হয়। মায়ের আদর, স্নেহ বা জিম্মাদারি কখনোই বুয়া বা গৃহশিক্ষক/গৃহশিক্ষিকাকে দিয়ে পাওয়া যায় না। কোনো মা সারাদিন বাইরে কাজ করেন আর বাসায় ফিরেও প্রচণ্ড ক্লান্ত থাকেন তাহলে তার সন্তানের কিই বা উপকার হলো? এতটা ক্লান্ত থাকলে একজন মায়ের শারীরিক বা মানসিক কোনো শক্তিই থাকে না যা দিয়ে তিনি সন্তানের বাড়তি যত্ন নেবেন বা তাদেরকে একটু পড়াশুনা করাবেন।

৪. পুরুষদের জন্যেও বিষয়টা নেতিবাচক। কারণ, নারীদের কর্মসংস্থান সাম্প্রতিক সময়ে অনেক বেড়ে যাওয়ায় এবং দুনিয়াবি নানা সুবিধার বিবেচনায় কর্মক্ষেত্রে নারীদেরকে অগ্রাধিকার দেয়ায় অনেক পুরুষ যোগ্যতা থাকার পরও কাজ পাচ্ছে না। ফলে, সমাজে দক্ষ ও যোগ্য পুরুষ বেকারের সংখ্যা ক্রমশই বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৫. কর্মস্থলের জন্যেও এর প্রভাব ইতিবাচক নয়। কেননা, নারীদের শারীরিক সহজাত নানা সমস্যার কারণে প্রায়শই তাদেরকে কর্মক্ষেত্রে অনুপস্থিত থাকতে হয়। যেমন, মাসের বিশেষ দিনগুলোতে, মাতৃত্বকালিন ছুটিতে, নানান অসুস্থতাসহ অন্যান্য কারণে মেয়েরা সব সময় অফিসে হাজির থাকতে পারেনা। আর পারলেও নিজ দায়িত্বটুকু সঠিকভাবে পালন করতে পারে না। ফলে কর্মস্থল অনেক সময়ই একজন নারীর নিয়মিত সেবা থেকে বঞ্চিতও হয়।

৬. নৈতিক দিক থেকেও এর প্রভাব ইতিবাচক নয় এ কারণে যে, কর্মস্থলে নারীকে কোনো ধরনের শারীরিক ও মানসিক লাঞ্ছনার শিকার হওয়ার সুযোগ থাকলে তা তার নৈতিক অবস্থানের জন্যে ক্ষতিকারক হয়ে থাকে। আর সার্বিকভাবে সমাজের জন্য তা কখনোই ভালো কোনো পরিণতি বয়ে আনে না যদি সেই সমাজের বাসিন্দারা সবার ওপরে টাকা উপার্জনকেই বেশি গুরুত্ব দেয়। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে, নৈতিকতা ও প্রতিষ্ঠিত নীতিমালার তুলনায় বৈষয়িকতাকে বেশী গুরুত্ব দেয়ায় নানা ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে।

৭. সার্বিকভাবে সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কেননা, নারীরা পুরুষের কাজ করতে শুরু করলে সমাজের স্বাভাবিক গতি প্রকৃতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, অনেকক্ষেত্রেই ভারসাম্য নষ্ট হয় এবং নানা ধরনের নৈরাজ্যকর পরিস্থিতির সূত্রপাত ঘটে।

১০.৩ কখন একজন নারী কাজ করতে পারে

উপরের আলোচনা থেকে আমরা কী এমনটা বুঝতে পেরেছি যে, আল্লাহ নারীদের

কাজ করাকে নিষিদ্ধ করেছেন? কখনোই নয়। তবে আমাদেরকে জানতে হবে যে, ঠিক কোন কারণে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে ইসলামি বিধান একজন নারীকে কাজ করার সুযোগ দিয়েছে। এবার আমরা সেই বিষয়েই আলোকপাত করব। যাতে আমরা অনুমোদিত আর অননুমোদিত বিষয়ের মধ্যে গুলিয়ে না ফেলি।

নারীর প্রথম এবং প্রধান দায়িত্ব হলো পরবর্তী প্রজন্মকে যথাযথভাবে পৃথিবীতে নিয়ে আসা এবং তাদেরকে ভালোভাবে প্রতিপালন করা। এ কাজটি কেবলই একজন নারীর এবং এক্ষেত্রে তার সমকক্ষ বা নারীর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার মতো কেউ নেই।

নারীকে আল্লাহ মানসিক ও শারীরিকভাবে এ কাজটির জন্যই প্রস্তুত করেছেন। তাই এর সঙ্গে অন্য কোনো জাগতিক বিষয়কে মিলিয়ে ফেলা একজন নারীরও উচিত নয়। কেননা, ভবিষ্যতকে ধারণ করার বিষয়টিতে কেউ নারীকে প্রতিস্থাপন করতে পারবে না।

এ বক্তব্যের অর্থ এটা নয় যে, শরীয়া নারীদেরকে ঘরের বাইরে কাজ করতে বাধা দিয়েছে। নির্ভরযোগ্য এবং যথার্থ তথ্যসূত্র ছাড়া কারো এ ধরনের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করার সুযোগ নেই।

এর ওপর ভিত্তি করে বলা যায়, নারীদের কাজ করার সুযোগ আছে। এমনকি প্রয়োজন ব্যতিরেকেই নারীরা কাজ করতে পারে। যদি একজন নারী বিধবা হয়, তালাকপ্রাপ্তা হয়, অথবা বিয়ে করার মতো কোনো সুযোগ আর না থাকে, অথবা অর্থ না থাকার কারণে যদি তাকে ক্রমাগতভাবে মানুষের অপবাদ ও লাঞ্ছনা শুনে যেতে হয়, তাহলেও তার ঘরের বাইরে কাজ করার অবকাশ আছে। কিংবা এমনও হতে পারে যে, পরিবারের স্বার্থেই নারীর কাজ করা দরকার।

স্বামী হয়ত তার সংসার চালানোর জন্য স্ত্রীর সাহায্যের প্রত্যাশা করছেন, অথবা নিজের সন্তান বা সঙ্গে থাকা ছোট ভাইবোনদের ব্যয় নির্বাহ করার জন্য, কিংবা বৃদ্ধ পিতামাতার দেখাশুনা করার জন্যও নারীকে কাজ করতে হতে পারে। যেমন, আল্লাহ সূরা আল কাসাসে সেই বৃদ্ধ পিতার দুই কন্যা সন্তানের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন :

وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ
مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ ۖ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا ۖ قَالَتَا لَا نَسْقِي
حَتَّىٰ يُصْدِرَ الرِّعَاءُ ۖ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ ○

> যখন তিনি মাদইয়ানের কূপের ধারে পৌছলেন, তখন কূপের কাছে একদল লোককে পেলেন তারা পশুদেরকে পানি পান করানোর কাজে রত। এবং তাদের পেছনে দুজন মহিলাকে দেখলেন তারা তাদের পশুদেরকে আগলিয়ে রাখছে। তিনি বললেন, তোমাদের কি ব্যাপার? তারা বলল, আমরা আমাদের পশুদেরকে পানি পান করাতে পারি না, যে পর্যন্ত রাখালরা তাদের পশুদেরকে নিয়ে সরে না যায়। আমাদের পিতা খুবই বৃদ্ধ।
>
> সূরা আল কাসাস ২৮ : ২৩

এমনও হতে পারে, সমাজই হয়ত একজন নারীর কাজ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতে পারে। ধরুন, মহিলা চিকিৎসক। সমাজে তার অবদানের দরকার আছে। বিশেষ করে স্ত্রীরোগে আক্রান্ত মহিলাদেরকে হয়ত একজন নারী সেবা দিয়ে সহযোগিতা করতে পারেন। কিংবা কোনো নারী সমাজের নারীদেরকে শিক্ষিত করতে পারেন, তাদের নারী সংশ্লিষ্ট নানা বিষয়ে তথ্য দিয়েও সহযোগিতা করতে পারেন। একজন নারী যতটা সহজে অপর একজন নারীকে বুঝাতে পারবেন, একজন পুরুষ হয়ত তেমনটা পারবেন না।

আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে নারীদের মাঝেও পুরুষদেরকে দিয়েই কাজ করাতে হবে। এ বাস্তবতাও আছে যা অস্বীকার করা যায় না। তবে, এ বিষয়টি স্থায়ী নিয়ম বানিয়ে নেয়ারও সুযোগ নেই। তাছাড়া একটি সমাজের উন্নয়নের জন্য সকল মানুষেরই পরিশ্রম ও শক্তিশালী ভূমিকা রাখা প্রয়োজন। সেই বাস্তবতায় যদি নারীদেরকে ঘরের বাইরে নানা ধরনের কাজে সম্পৃক্ত হওয়ার সুযোগও দেয়া হয়, সেক্ষেত্রেও কিছু শর্তকে বিবেচনায় নিতে হবে। যেমন :

১. যে কাজে নারী যুক্ত হবেন তা ইসলামের বিধিসম্মত হতে হবে। অর্থাৎ স্পষ্ট হারাম কোনো কাজে সে যুক্ত হতে পারবে না। এমনকি যে কাজটি আপাত দৃষ্টিতে হারাম নয়, তবে করতে গেলে হারাম পথে চলে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে, সেই কাজটিও করা যাবে না। যেমন, একটি ব্যাচেলর পুরুষদের মেসে যখন বুয়া কাজ করে, কিংবা নারীকে যখন কোনো অফিসের বসের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা হিসেবে কাজ করতে হয় তখন বিষয়গুলো শরীয়ার দৃষ্টিতে ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে যায়।

   কেননা, তাকে অনেকটা সময় সেই কর্মকর্তার সঙ্গে হয়ত একান্তে থাকতে হয়। একইভাবে নারীকে কোনো বারে মদ সরবরাহ করা কিংবা কোনো অশ্লীল আয়োজনে নাচ ও গানের সঙ্গে যুক্ত হওয়া যাবে না। কেননা, তার এ জাতীয় কার্যক্রম পুরুষের মনে কামুকতা জাগ্রত করতে পারে।

   রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেই মানুষগুলোকে অভিশাপ

দিয়েছেন যারা মদ তৈরি করে, মদ বিক্রি করে এবং মদ বহন করে নিয়ে যায়। আমাদেরকে তাই এ জাতীয় কাজের বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে। একজন নারীর বিমানবালাও হওয়া উচিত নয়। কারণ এ ধরনের কাজে সে যে পোশাক পড়ে তা ইসলাম অনুমোদন করে না। একইসঙ্গে বিমানবালাকে তার চাকরির অংশ হিসেবে একজন যাত্রীকে নানা ধরনের হারাম খাদ্য পরিবেশন করতে হয়। তাছাড়া এ ধরনের কাজে নারীকে একা একা অনেক রাত দেশের বাইরেও কাটাতে হয়, যা সবসময় নিরাপদ নাও হতে পারে। ঠিক একইভাবে ইসলাম অনুমোদন করে না এ জাতীয় অন্যান্য কাজেও নারীরা যুক্ত হতে পারবে না। আর সার্বিকভাবে যে কাজগুলোকে ইসলাম নারী ও পুরুষ সবার জন্যই হারাম করেছে, তাতেও সম্পৃক্ত হওয়ার কোনো সুযোগ নেই।

২. নারীকে তার কাজের স্বার্থে ঘরের বাইরে যেতে হলে তাকে ইসলাম অনুমোদিত পোশাক পরিধান করতে হবে। তার কথাবার্তা এবং হাঁটাহাটিতেও ইসলামের নির্দেশনাগুলোকে বাস্তবায়ন করতে হবে। আল্লাহ্ বলেন :

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ
زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ
زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اٰبَآئِهِنَّ اَوْ اٰبَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اَبْنَآئِهِنَّ اَوْ اَبْنَآءِ
بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْٓ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْٓ اَخَوٰتِهِنَّ اَوْ نِسَآئِهِنَّ اَوْ
مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ اَوِ التّٰبِعِيْنَ غَيْرِ اُولِى الْاِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ اَوِ الطِّفْلِ
الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوْا عَلٰى عَوْرٰتِ النِّسَآءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِاَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا
يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ ط

আর মুমিন নারীদেরকে বলো, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে ও তাহাদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করে; তারা যেন যা সাধারণত প্রকাশ থাকে তা ব্যতীত তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে এবং তারা যেন তাদের মাথার ওড়না বুকের উপর ফেলে রাখে এবং তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভগ্নিপুত্র, স্ত্রীলোক, অধিকারভুক্ত বাঁদী, যৌনকামনামুক্ত পুরুষ ও বালক, যারা নারীদের গোপন

অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ, তাদের ব্যতীত কারো কাছে তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে। তারা যেন তাদের গোপন সাজ-সজ্জা প্রকাশ করার জন্য জমিনে জোরে পদচারণা না করে। সূরা আন নূর ২৪ : ৩১

আল্লাহ্ আরও বলেন :

اِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِىْ فِىْ قَلْبِهٖ مَرَضٌ وَّ قُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا ○

যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় করো তাহলে পরপুরুষের সঙ্গে কোমল ও আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে কথা বলবে না। যার মনে ব্যাধি রয়েছে, তোমাদের এ ধরণের কথাবার্তায় তার মনে কুবাসনা তৈরি হতে পারে। বরং তোমরা অন্যের সঙ্গে ভাবগাম্ভীর্যতা ও ব্যক্তিত্ব সমুন্নত রেখে কথা বলবে। সূরা আল আহযাব ৩৩ : ৩২

৩. তার ঘরের বাইরের কাজ যেন তার মৌলিক ও সাংসারিক কাজগুলোকে ক্ষতিগ্রস্ত না করে। মনে রাখতে হবে, স্বামী, সন্তান ও সংসারের দেখাশুনা করাই একজন নারীর প্রাথমিক দায়িত্ব।

৪. যদি একটি সমাজ কোনো নারীর কাছ থেকে অবদান ও ভূমিকা আশা করে বা যদি সেই ধরনের প্রয়োজনীয়তা তৈরি হয় সেক্ষেত্রে মুসলিমদের কাজ হলো এমন কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা এবং কাঠামো তৈরি করা, যাতে মুসলিম নারীরা নিজেদের সতীত্ব ও নারীত্বকে হেফাজত করেই কাজ করে যেতে পারে। আল্লাহর প্রতি, নিজের প্রতি এবং সংসারের প্রতি নারীর যে দায়বদ্ধতা আছে, সেগুলোকে অক্ষুণ্ন রেখেই নারীকে কাজ করার সুযোগ তৈরি করে দিতে হবে।

এ ধরনের কোনো সার্বিক পরিস্থিতি সৃষ্টি করা গেলে নারীরা যেমন নিজেদের কাজগুলো করতে পারবে, আবার তেমনি নিজস্ব অধিকারগুলোকেও সংরক্ষণ করতে পারবে। পাশাপাশি, এমনকিছু ব্যবস্থা রাখা যায়, যেখানে নারীরা পার্ট টাইম বা সপ্তাহে তিনদিন কাজ করে স্বাভাবিকের চেয়ে অর্ধেক বেতন উপার্জন করতে পারবে। সেই সঙ্গে নারীকে তার বিয়ে, সংসার, সন্তান প্রসব এবং প্রতিপালনের জন্যেও প্রয়োজনমতো ছুটি দিতে হবে।

৫. একইসঙ্গে, শুধুমাত্র নারীদের জন্য কিছু স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠা করা যায় যেখানে তারা তাদের জন্য উপযোগী খেলাধুলা এবং ব্যায়াম করার সুযোগ পাবে। যেখানে তারা ইচ্ছেমতো চলতে পারবে এবং

নানা ধরনের সৃজনশীল কাজকর্ম করতে পারবে। পাশাপাশি, যৌন হয়রানির আশঙ্কা থেকে মুক্ত রেখে নারীদেরকে মন্ত্রণালয়ে, নানা ধরনের সরকারী স্থাপনায় এবং ব্যাংকেও কাজ করতে দেয়া যেতে পারে। মনে রাখতে হবে, একক কোনো পুরুষের সঙ্গে নারীকে এক ঘরে কাজ করতে দেয়া যাবে না। তবে এমন পরিবেশে নারী ইসলামী পোশাক পরিধান করে এবং শরীয়াহর নির্দেশনা মেনে অবশ্যই কাজ করতে পারে যেখানে আরো অনেক পুরুষ ও নারী আছে। এ দুই নীতিমালার ওপর ভিত্তি করে নারীদের কাজের জন্য আরো অনেক কাজের উপায়ও যে বের করা সম্ভব তা বলাই বাহুল্য। আর আল্লাহ কুরআনে বলেছেন, যারা সত্য পথের ওপর থাকতে চায় আল্লাহ তাদের জন্য সত্য পথের দিশা উন্মুক্ত করে দেন।

আল্লাহ রব্বুল আলামীন আমাদেরকে জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে ইসলামের নির্দেশনা অনুসরণ করার এবং আল্লাহর সন্তুষ্টিমতো জীবন যাপন করার তওফিক দিন। আমিন।

নারী সম্পর্কে ইসলামের নীতি বা দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তুমুল নেতিবাচক কথা বলা হয়ে থাকে। তাই ইসলামের বিধান কতটা নারী-বান্ধব তা স্পষ্ট করা আবশ্যক। এসব বিধানের ফলপ্রসু প্রয়োগ সম্ভাব্যতা নিয়ে বুদ্ধিবৃত্তিক বিশ্লেষণও খুবই প্রাসঙ্গিক।

তাছাড়া, নতুন প্রজন্মের চিন্তা-দিগন্তে ঘুরপাক খাওয়া প্রশ্নগুলোর জবাব তুলে ধরার দায়িত্বটা পালন না করলেই নয়। এমন তাগিদ থেকেই আমরা যুগশ্রেষ্ঠ মুসলিম স্কলার ডঃ ইউসুফ আল কারযাভীর বেশ কয়েক বছর আগে লেখা বইটিকে বাংলায় পাঠকের কাছে উপস্থাপন করা কল্যাণকর মনে করেছি। অনুসন্ধিৎসু পাঠককে বলব, পড়ে দেখুন। ইনশাআল্লাহ চিন্তার খোরাক পাবেন।

ঋদ্ধ প্রকাশন